বৈষ্ণব কাব্যের তিনদিক

রণেন্দ্রনাথ দেব

উৎসর্গ

বাবা ও মা

শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ দেব

শ্রীযুক্তা জ্যোৎস্না দেব

শ্রীচরণ কমলেষু ॥

ভূমিকা

বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা পাঠ করে যাঁরা অভ্যস্ত এই গ্রন্থ পাঠে তাঁরা প্রত্যাশিত উৎকর্ষের অভাবে ক্ষুণ্ণ হতে পারেন। সাধারণত বৈষ্ণব-কাব্যের আলোচনায় ধর্ম-পটভূমিকাকে মুখ্য করে তোলা হয় এবং বৈষ্ণব-সাহিত্য পাঠে সেই পটভূমির প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে অন্যবিধ দৃষ্টিকোণের অবতারণা করা হয়েছে।

প্রথম প্রবন্ধটিতে, পদাবলীর শিল্পকর্ম মুখ্য আলোচ্য বিষয়। শিল্পকর্মের সকল দিক নয়, বিশেষভাবে চিত্রকল্পসমূহের বৈশিষ্ট নির্দেশ করেছি।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে, বৈষ্ণবসাহিত্যের যে আখ্যান সমূহ আছে তাদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যনিচয়ের সবগুলির আলোচনা না করে এদের মধ্যে বিশিষ্টতম রচনা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে কেন্দ্র রেখে বিচার করা হয়েছে।

তৃতীয় প্রবন্ধটিতে, বৈষ্ণবসাহিত্যে সমকালীন সমাজ-জীবনের পবিচয় উদ্ঘাটনের প্রয়াস রয়েছে। প্রধানত চৈতন্যচরিতাবলী ও কৃষ্ণমঙ্গল থেকে এর উপাদান সংগ্রহ করেছি।

তিনটি প্রবন্ধে তিন দৃষ্টিকোণ থেকে বৈষ্ণবকাব্য আলোচনার এই প্রচেষ্টা সম্ভবত সুসম্পন্ন হয়নি। সংক্ষিপ্ত পরিসরে কোনো একটি দিকেরই পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। আলোচনার মৌলিকত্ব বিষয়েও আমি কোনো দাবি জানাতে পারি না। আচার্য শ্রীসুনীলকুমার দে, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুকুমার সেন ৺বাণীকান্ত কাকতি, J. Gonda, ৺হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, ৺রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর প্রভৃতি সুবিখ্যাত পূর্বাচার্যবৃন্দের রচনার কাছে আমি কতখানি ঋণী তা অভিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই বুঝবেন। বিশেষত আমার শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেনের কাছে ঋণ অপরিশোধ্য, এই গ্রন্থের তৃতীয় প্রবন্ধটি তাঁরই একটি প্রখ্যাত রচনাকে আদর্শ করে লেখা।

নিজে প্রুফ দেখতে না পারায় বানান ভুল ও অন্যান্য ভ্রান্তি রয়ে গেল। আগামী সংস্করণে এসব ত্রুটি শোধরানো যাবে। ইতিমধ্যে আলোচনার যৌক্তিকতা বিষয়ে পাঠক সাধারণের অভিমতও জানতে পারবো আশা করি।

গ্রন্থ রচনায় আমার পিতামাতার শুভেচ্ছা ও ভ্রাতা-ভগ্নী শ্রীমতী অঞ্জলি, অর্চনা, অপর্ণা, অঞ্জনা ও শ্রীমান মননকুমারের সহযোগিতা ক্রিয়াশীল ছিল। সর্বোপরি শ্রীযুক্ত দেবকুমার বসু গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব ও উদ্বেগ স্বেচ্ছায় স্বীকার করে অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

কলিকাতা
১৩ই নভেম্বর, ১৯৫৯

রণেন্দ্রনাথ দেব

পদাবলীর চিত্রকল্প

১

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সহস্র সহস্র পদ নিয়ে গঠিত। এসকল পদের সংখ্যা প্রচুর হলেও এদের বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য অল্প। একই রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার বিভিন্ন পর্য্যায়, কয়েকটি বিশিষ্ট উল্লাসময় ও বেদনাকর অভিজ্ঞতার বর্ণনায় তা সীমাবদ্ধ। সেই কারণে বৈষ্ণব কবিরা যে সকল চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন তারও মধ্যে সমজাতীয়ত্ব আছে। যেন একই ধরণের চিত্রকল্পনা (Pictorial imagination) নানা কবির মধ্যে কালে কালে স্ফুরিত হয়েছে। এর কিছুটা নিশ্চয়ই কবিদের মধ্যে পরীক্ষা-প্রবণতার অভাব ও গতানুগতিকত্বে সন্তুষ্ট থাকার ফল। কিন্তু যে-বিষয়বস্তু তাঁদের সকলের উপজীব্য, যে-কৃষ্ণ-প্রেমের আধারে তাঁদের সকল ধ্যানের পরিসমাপ্তি তাতে নিত্য নব বৈচিত্র্য সৃষ্টির অবকাশ খুব বেশি ছিল কিনা সন্দেহের বিষয়। আলঙ্কারিকদের ব্যবহৃত একটি উদাহরণের উল্লেখ করে বলা যায় স্ফটিকখণ্ড যেমন জবা প্রভৃতি নানা বস্তুর সংস্পর্শে এসে নানাবর্ণ ধারণ করে, তেমনি পদাবলীতে চিত্রকল্পের যেটুকু বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় তা বিভিন্ন কবিমানসের পৃথক পৃথক বর্ণের দ্বারা অনুরঞ্জিত মাত্র।

পদাবলীর চিত্রকল্পসমূহের বিশিষ্টতা বুঝতে হলে কবিরা কোন কোন্ উপমা ব্যবহার করেছেন দেখা দরকার। যেসকল দৃশ্যবস্তু পদসাহিত্যের উপমা ও বর্ণনার ভিত্তিনির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে তাদের দ্বারাই কবিদের চিত্রকল্পনার প্রসার ও বৈচিত্র্য পরিস্ফুটিত হবে। সন্দেহ নেই, যেমন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের অধিকাংশ ক্ষেত্রে, তেমনি পদাবলীতেও উপমা-উৎপ্রেক্ষাগুলি অতি ব্যবহারে জীর্ণ ও অনুজ্জ্বল। দুটি বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য প্রদর্শনের দ্বারা যে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হতে পারে পুনরুক্তির ফলে তা আচ্ছন্ন হতে বাধ্য। পদকর্ত্তারা সচরাচর কি ধরণের উপমা প্রয়োগ করতেন তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। বিদ্যাপতি বলছেন—

কবিবর রাজহংস জিনি গামিনি
চললিহুঁ সঙ্কেত গেহা
অমলা তড়িত দণ্ড হেমমঞ্জরি
জিনি অতি সুন্দর দেহা।

জলধর তিমির চামর জিনি কুন্তল
অলকাভৃঙ্গ সৈবালে
ভাভুলতা ধনু ভ্রমব ভুজঙ্গিনি
জিনি আধ বিধুবর ভালে।
নলিনি চকোর সফরিবর মধুকর
মৃগি খঞ্জন জিনি আখী
নাসা তিলফুল গরুড়চঞ্চু জিনি
গিধিনি স্রবণ বিসেখী।
কনক-মুকুর সসি কমল জিনিযা মুখ
জিনি বিম্ব অধব পঙারে
দসন মুকুতা জিনি কুন্দ করগবীজ
জিনি কম্বু কণ্ঠ আকারে।
বেল তালজুগ হেম-কলস গিরি
কটোরা জিনিআ কুচ সাজা
বাহুমৃণাল পাস বল্লরি জিনি
ডমরু সিংহ জিনি মাঝা।
লোমলতাবলী সৈবল কজ্জল
ত্রিবলি তরঙ্গ নিরঙ্গা
নাভি সবোবর সরোরুহদল জিনি
নিতম্ব জিনিআ গজকুন্তা।
উরুজুগ কদলি করিবর জিনি
স্থল পঙ্কজ জিনি পদপানী
নখ দাড়িমবীজ ইন্দুরতন জিনি
পিকু জিনি অমিয়া বাণী।

এখানে ব্যতিরেক অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্যটুকু বাদ দিলে এইসব উপমা পাওয়া যায়। গমনের সঙ্গে করিবর ও রাজহংসীর ভঙ্গির ; দেহবর্ণের সঙ্গে নির্মল বিদ্যুদ্দণ্ড ও হেমমঞ্জরীর ; কুন্তলের সঙ্গে মেঘ, অন্ধকার ও চামরের ; অলকের সঙ্গে মধুকর ও শৈবালের ; ভ্রুর সঙ্গে মধুকর, কন্দর্পের ধনু ও সর্পের ললাটের সঙ্গে অর্ধচন্দ্রের ; চোখের সঙ্গে কমলিনী, চকোর, সফরী, ভ্রমর, মৃগী ও

খঞ্জনের ; নাসার সঙ্গে তিলফুল ও গরুড় চঞ্চুর ; মুখের সঙ্গে স্বর্ণমুকুর, চন্দ্র ও কমলের ; অধরের সঙ্গে বিম্বফল ও প্রবালের ; দন্তের সঙ্গে মুক্তা, কুন্দ ও দাড়িম্ববীজের ; কণ্ঠের সঙ্গে শঙ্খের ; স্তনের সঙ্গে বেল, তালযুগল, স্বর্ণকলস, গিরি ও কটোরির ; বাহুর সঙ্গে মৃণাল, বল্লরী ও পাশের ; কটীর সঙ্গে ডমরু ও সিংহের ; রোমাবলীর সঙ্গে শৈবাল ও কজ্জলের ; ত্রিবলীর সঙ্গে তরঙ্গিনীর ; নাভির সঙ্গে সরোবর ও পদ্মের ; নিতম্বের সঙ্গে হস্তিকুম্ভের ; উরুদ্বয়ের সঙ্গে হস্তিশুণ্ডের ; পদ ও হস্তের সঙ্গে স্থলকমলের ; নখের সঙ্গে দাড়িম্ববীজ, চন্দ্র ও রত্নের এবং বচনের সঙ্গে কোকিল ও অমৃতের তুলনা করা হয়েছে। একশোটি বৈষ্ণব পদ পড়লে এই সব উপমাই আমরা ঘুরে ফিরে পাই। বিদ্যাপতি একটি পদে যে সব উপমা সংগৃহীত করেছেন নানা কবি তাকে বিস্তারিত করেছেন মাত্র (বিদ্যাপতির উপমাভাণ্ডারও সম্পূর্ণ নিজস্ব নয়)। বড় জোর এরই মধ্যে কোনো কোনো কবি একটু স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করতে পারেন বলবার ভঙ্গি সামান্য বদলে দিয়ে, যেমন হয়েছে রায় শেখরের এই পদটিতে—

কবরীভয়ে চমরী গেও গিরিকন্দরে
মুখভয়ে চাঁদ আকাশে
হরিণী নয়ন ভয়ে স্বরভয়ে কোকিল
গতিভয়ে গজ বনবাসে।

কিংবা চণ্ডীদাসেব পদে

কম্বু জিনিযা কেবা কণ্ঠ বানাইলরে
কোকিল জিনিয়া সুস্বর
আরদ্র মাখিযা কেবা সারদ্র বানাইল রে
ঐছন দেখি পীতাম্বর।

এইগুলি প্রকৃত পক্ষে পুরাতন উপমারই রূপান্তর। সামান্য পরিমার্জনের দ্বারা পুরাতন উপমাতে কিছুটা নূতন ব্যঞ্জনা আনা হযেছে। চণ্ডীদাসের আরো একটি পদে এব উদাহরণ দেখানো যায। কৃষ্ণের দেহের সঙ্গে কাজল ও মেঘের উপমা সুপ্রসিদ্ধ। কবি এই কথাটাই বলেছেন অন্যভাবে—

কালার ভরমে হাম জলদে না হেরি গো
ত্যজিয়াছি কাজরের সাধ।

কেশের সঙ্গে চামরের ও দশনের সঙ্গে মুক্তার তুলনাও বহুপ্রচলিত।

গোবিন্দদাস এই উপমাটিকে এইভাবে উপস্থাপিত করেছেন—

চিকুরে চোরায়সি চামরকাঁতি
দশনে চোরায়সি মোতিম পাঁতি।

ভঙ্গির অভিনবত্বটুকু বাদ দিলে এসব পদে চিত্রকল্পনার কোনো অভিনবত্ব ধরা পড়ে না। কিন্তু কবি যদি রাধার নাসিকার তুলনা দিতে গিয়ে তিলফুলকে ত্যাগ করে বলেন—

নাসিকা ণালিক যন্ত্র সমানে। (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন)

অর্থাৎ 'নলাকার যন্ত্রের ন্যায়', তখন একটি নূতন চিত্র দেখা দেয়। বলাবাহুল্য এরকম নূতন ধরণের উপমা পদাবলী সাহিত্যে সুলভ নয়। কবিরা পুরাতন উপমা-সম্ভারই বারংবার ব্যবহার করেছেন, অধরকে বলেছেন প্রবাল-তুল্য, নারী যেন হরিণী, মদন ব্যাধ, অঙ্গ শিরিষফুলের মতো কোমল, একজনের মুখ চন্দ্র, অপরের নয়ন চকোর, কিংবা সুন্দরী যেন স্বর্ণলতা—কনক লতায়ে যৈছে বেঢ়ল তমাল। বড় কবি এই পুরাতন ভাণ্ডারকেই নূতন পদ্ধতিতে প্রযোগ করে চলেন। পায়ের সঙ্গে পদ্মের তুলনা বিদ্যাপতির পদে হলো এই রকম—

জহাঁ জহাঁ পদযুগ ধরঈ
তহিঁ তহিঁ সরোরুহ ভরঈ।

কিংবা আর একটু সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে কবি বলেছেন রাধার কাছে কৃষ্ণই সর্বস্ব, যেন—

হাতক দরপণ মাথক ফুল
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বূল।
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার
দেহক সরবস গেহক সার।

বিদ্যাপতির ক্ষেত্রে যে কথা সত্য অন্য কবিদের ক্ষেত্রেও তাই। সর্বজন পরিচিত কয়েকটি দৃশ্যবস্তুকে কবিরা নানা উপায়ে প্রযোগ করে গেছেন।

২

রাধা এবং কৃষ্ণের যে প্রেমলীলা বৈষ্ণব কাব্যের উপজীব্য তার প্রথম স্তর পূর্বরাগ। পূর্বরাগের পটভূমিকা রচনা করেছে পরস্পরের রূপবর্ণনা। কবিরা অক্লান্ত উৎসাহে অজস্র উপমার দ্বারা রাধা ও কৃষ্ণের দেহগত রূপকে ফুটিয়ে

তুলেছেন। উপমাগুলির উৎস দুটি—প্রকৃতিজগৎ ও মানব জগৎ। কবিরা প্রকৃতিজগতের ফুল, লতা, বৃক্ষ, মেঘ প্রভৃতি থেকে যেমন উপাদান সংগ্রহ করেছেন তেমনি প্রাণীদের কথাও বিস্মৃত হননি। আবার একই বস্তু যেমন পাখী কিংবা চাঁদ কিংবা মেঘ সবসময় একই আবেগের স্ফুটনে ব্যবহৃত হয়নি। এদের একাধিক ব্যঞ্জনা আছে। কোন্ কোন্ বস্তুর উল্লেখ সবচেয়ে বেশী পাই তার হিসাব নিলে কবিদের কল্পনার বিচরণ—পথটি স্পষ্ট হবে। যেমন বলা যায় পদ্মের কথা। একথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে পদাবলীতে পদ্মের মতো আর কোনো ফুল এত ব্যাপকভাবে উদাহৃত হয়নি।

বিদ্যাপতি বলছেন—

অধর সুশোভিত বদন সুছন্দ
মধুরী ফুলে পজু অরবিন্দ।

বঙ্কিম অধর দেখে মনে হয় যেন বাধুলি ফুলে পদ্মের পূজা করা হলো। মুখ এখানে পদ্ম। চোখের বর্ণনা প্রসঙ্গে পদ্মের উপমাটিকে কবি সামান্য পরিবর্তিত করে বললেন—এক কমল দুই খঞ্জন খেল, এক পদ্মে দুটি খঞ্জন খেলা করছে। পদ্ম এবং মৃণাল শুধু মুখ নয়, রাধার দেহের পেলব নমনীয়তা বোঝাতেও প্রযুক্ত হলো। কৃষ্ণের উন্মত্ত আবেগের কাছে রাধা অসহায়, যেন হাতীর শুঁড়ে পদ্মনাল, হাথি হাথ জনি পড়লি পঞোনারি। আবার রাধা যখন বেদনায় মলিন তখনও পদ্মের উপমা দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সে পদ্ম তুষার খিন্ন—

যৈছন তুহিন ররিখে রজনী
করকমল না সহএ পরাণে।—বিদ্যাপতি।

রাত্রির ররফপাতের পর পদ্ম যেমন সামান্য করস্পর্শও সহ্য করতে পারে না। এবং

তো বিনু সুন্দরী ঐছন ভেলহি
যৈছে নলিনী পর পালা। —বিদ্যাপতি।

তোমার বিরহে সুন্দরীর অবস্থা সেরকম নলিনীর উপর ররফপাত হলে যেমন হয়।

পদ্মের পরেই উল্লেখযোগ্য ফুল বান্ধুলী। ওষ্ঠাধরে বঙ্কিমাভা বোঝাতে বান্ধুলীর দৃষ্টান্ত বার বার দেওয়া হয়েছে। এটির প্রয়োগ মূলত আনন্দের

উজ্জ্বলতা বোঝাবার জন্য। কিন্তু রাধার বিমর্ষ মুখচ্ছবি বোঝাতে কবি দ্বারস্থ হয়েছেন অন্য ফুলের। তখন

অরুণ অধর বান্ধুলি তুল
পাণ্ডুর ভৈ গেল ধুতুর তুল।—জ্ঞানদাস।

যেমন পদ্মফুল, যেমন বাঁধুলী, তেমনি লতাও রাধার অন্য উপমান। বিদ্যাপতি রাধাকে বলেছেন দ্রোণলতার মতো। রাধা ও কৃষ্ণের যুগল মূর্তি হচ্ছে কনক-লতাবেষ্টিত শ্যামল তমাল তরু। এখানে কৃষ্ণ বৃক্ষের সঙ্গে তুলিত হলেন। আবার বৃক্ষের সঙ্গে সমগ্র প্রেমক্রিয়ারও তুলনা করা হয়েছে। বিদ্যাপতির পদে রাধা বলেছেন প্রেমতরু আপনা আপনি বেড়ে উঠে সৌরভে দশদিকে ব্যাপ্ত করে দিয়েছে—

সাখা পল্লব কুসুম বেআপল
সৌরভ দহদিস গেলা।

কিন্তু প্রোষিতভর্তৃকা রাধা এই প্রেমকেই বলেছেন বিষবৃক্ষ কিংবা তালবৃক্ষের ছায়ার মতো—

তৃণতরুঅর ছায়াতর বৈসলাহু
জইসন উচিত সে ভেলা।—বিদ্যাপতি।

তালবৃক্ষের ছায়ায় বসে উচিত ফল পেলাম অর্থাৎ উত্তাপে দগ্ধ হতে হলো। শুধু ফুল, কিশলয় কিংবা বৃক্ষ নয়. কখনো কখনো সমগ্র বনপ্রকৃতিই উপমানে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রেমের গহন জটিলতাকে জ্ঞানদাস একটি পদে চমৎকার প্রকাশ করেছেন—

যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।

ফুলের প্রসঙ্গে এসে পড়ে প্রাণিজগতের কথা। বৈষ্ণব কবিরা কত রকম পাখি ও পশুর উল্লেখ করেছেন দেখা দরকার। মুখকে যখনই কবিরা পদ্মের সঙ্গে তুলনা করেছেন, চোখকে বলেছেন ভ্রমর কিংবা খঞ্জন, লক্ষ্য করতে হয় গতি কিংবা চাঞ্চল্য বোঝাবার জন্যই পাখি কিংবা অন্য প্রাণীর অবতারণা করা হয়েছে বিশেষভাবে।

চোখের সঙ্গে খঞ্জনের তুলনা খুব ব্যাপক। বিদ্যাপতি মুখের সঙ্গে কমলের তুলনা করে চোখ দুটিকে বলেছেন খঞ্জন—চহকি চহকি দুই খঞ্জন খেল, চহক চহক রবে খেলা করছে। বড়ু চণ্ডীদাস বলেছেন—

আঞ্চল চঞ্চল তোর খঞ্জন নয়নে

আর্জুনের বাণ জিনী তাহাব সন্ধানে।

খঞ্জনেব এই চটুলতাব সঙ্গে দৃষ্টিব চাঞ্চল্যেব মিল থাকলেও কবিরা এতে তৃপ্ত হননি। অন্যবিধ দৃষ্টিও আছে, তাব জন্যে ভিন্নতর উপমান প্রযোজন। যে দৃষ্টি বসেব গভীবে নিমজ্জিত তাব তুলনা খঞ্জন নয, মধুকব। বিদ্যাপতিব একটি সুবিখ্যাত পদে ভ্রমবেব উপমা পাচ্ছি—

মধুপ মাতল উডএ ন পাবএ

তইঅও পসাব এ পাঁখি।

মাধবেব মুখ থেকে রাধা চোখ সবাতে পাবলেন না, মধুপানোন্মত্ত ভ্রমব যেমন ইচ্ছা কবলেও পক্ষবিস্তাব কবতে পাবেনা। বিদ্যাপতি আবেকবাব ভ্রমরেব উপমা দিযেছেন বতিশ্রান্ত কৃষ্ণেব মূর্তি আঁকতে গিযে—মধু পিবি মধুকব সুতল সবোজে। বাধাব দেহ সৌবভে লুব্ধ কৃষ্ণ ভ্রমবেব মতো ঘুবে বেডান।

আমাব অঙ্গেব সৌবভ পাইলে

ঘুবি ঘুবি জন্ম ভ্রমবা বুলে।—গোবিন্দদাস।

কিন্তু মধুকব যেমন বসসন্ধানী তেমনি বহুনিষ্ঠও বটে। বৈষ্ণবকাব্যে তাই ভ্রমবেব অন্য ব্যঞ্জনা পুরুষেব অবিশ্বাসিতা,

পুরুষ ভমবসম কুসুমে কুসুমে বম

পেঅসি কবএ কি পাবে।—বিদ্যাপতি।

পুরুষ ভ্রমবেব মতো ফুলে ফুলে মধু খেযে বেডালে প্রেযসী কি কবতে পাবে?

পক্ষী-পতঙ্গেব মতো মাছও পদাবলীব একটি বহু প্রচলিত উপমা। বিদ্যাপতিব পদে আছে—

পাখীক পাখ মীনক পানি।

'পাখিব পক্ষে যেমন পাখা মাছেব পক্ষে যেমন জল' বাধাব পক্ষে তেমনি কৃষ্ণই সব। মাছেব চিত্র কবিবা অন্যভাবেও এঁকেছেন। নবহবিদাস বাধাব সর্ব্ববাধাতুচ্ছকবা প্রেমেব সঙ্গে তুলনা দিযেছেন প্রথম বর্ষাব জলে উজিযে ওঠা মাছেব, মৃত্যুভয যে ভুলে গেছে—

নবীন পাউষেব মীন মবণ না জানে

শ্যাম অনুবাগে চিত নিষেধ না মানে।

আবাব, সংসাবেব শান্তি ও প্রাচুর্যেব মধ্যে অশান্ত হৃদযেব প্রতীকও মাছ

অগাধ সলিলে মীন মরয়ে পিয়াসে।—নরোত্তম দাস।

প্রাণিজগৎ থেকে গৃহীত অন্য ক'টি উপমান হচ্ছে হরিণী, সিংহ, ও হস্তী। রাধার কটিদেশের ক্ষীণতা সিংহের অনুরূপ—

যাকর মাঝ হেরি মৃগরাজ

ভয়ে পৈঠল গিরিকন্দর মাঝ।— বলরাম দাস।

রাধা যখন ভয়ত্রস্তা তখন তিনি হরিণীর মতো। জ্ঞানদাস লিখেছেন—

হরিণী পালাঞা যাইতে ঠেকিল ব্যাধের হাতে

এমতি ঠেকিয়া গেল রাধা।

এই উপমা অন্য রূপেও পাওয়া যায়, যেমন চণ্ডীদাসে 'পিয়াসে হরিণী যেন পড়য়ে সঙ্কটে,' অথবা—

বিষাইল কাণ্ডের ঘায়ে যেহেন হরিণী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

স্তনের সঙ্গে গজকুম্ভের ও হাতীর শুঁড়ের সঙ্গে কৃষ্ণের ভুজদ্বয়ের তুলনা আছে এবং মদমত্ত হাতীর সঙ্গে যৌবনের আবেগ প্রাবল্যের সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে,

এনব যৌবন বড়ায়ি মযমত্ত করী

লাজ আঙ্কুশেঁ তাক নিবারিতে নারী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

কিন্তু পদাবলীতে সবচেয়ে চমকপ্রদ জৈব উপমান হল সাপ।

শরীরের কোনো অংঙ্গের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখাবার জন্যই সম্ভবত প্রথম সাপের উপমা প্রযুক্ত হয়। বিদ্যাপতির পদে আছে—

নাভিবিবর সঞে লোমলতাবলী

ভুজগি নিশ্বাস পিয়াসা।

নাভিবিবর হতে লোমলতাবলী বার হয়েছে, যেন ভুজঙ্গিনী নিশ্বাস নেবার জন্য বাইরে এলো। রোমের এই বর্ণনা অন্যান্য কবিরাও গ্রহণ করেছেন—

রোমলতাবলী ভুজগীভাণ

নাভিসরোবরে কর পয়ান।—জ্ঞানদাস।

নাভিসরোবরে লোম ভুজগিনী

বিহরে কুচগিরিকোর রে।—বলরাম দাস।

রোমাবলী ছাড়া বেণীরও উপমান সর্প। বিদ্যাপতি কুচের ওপর লুণ্ঠিত বেণীকে দেখে বলেছেন যেন কৃষ্ণসপিনী স্বর্ণ গিরিতে শুয়ে আছে—

কলস কুচ লোটাইলী

ঘন সামরি বেণী
কনয় পরয স্থতলী
জনি কারি নাগিণী।

প্রায একই রীতিকে কৃষ্ণবেণীর সৌন্দর্য্য স্বর্ণকুণ্ডলের পাশে প্রতিস্থাপন করে দেখিয়েছেন গোবিন্দ দাস—

কুণ্ডলচক্র বিকাশে
বেণী ভুজঙ্গিণী পাশে।

সাপের কৃষ্ণত্বকের চিক্কণ সৌন্দর্য্যের সঙ্গে ভ্রু, রোমলতা ও বেণীর তুলনা সার্থক ও সুপ্রযুক্ত সংশয় নেই। কিন্তু সাপের অন্যবিধ বৈশিষ্ট্য, তার তীব্রতা ও কুটিল গতিভঙ্গি, এজাতীয় উপমায় প্রাধান্য পেয়েছে। রাধা কৃষ্ণের প্রতি বিমুখ হলে কবি লিখলেন—

কুচযুগ পরসিতে মোড়ই অঙ্গ
মন্ত্র না মানে জনু বাল ভুজঙ্গ।—বিদ্যাপতি (?)

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধাও গর্বভরে বলেছিলেন

আহ্মার যৌবন কাল ভুজঙ্গম
ছুইলেঁ খাইলেঁ মরী।

কিন্তু রাধার এই দর্পোক্তির উত্তর কৃষ্ণ সাপেরই আরেকটি উপমার সাহায্যে দিয়েছেন—

এথার্সি সুন্দরি রাধা কর কাঠদাপ
তথাঁ গেলে হইবি যেহ্ন বাদিআর সাপ।

পদাবলীতে সাপের আরেক রকম চিত্র আছে। সেখানে সাপ শুধু বিশেষ একটি অঙ্গের অনুরূপ কিংবা মানবস্বভাবের বিশেষ একটি গুণের প্রতীক নয়। রাধা ও কৃষ্ণের সমগ্র ব্যক্তিত্বই যেন সর্পধর্ম প্রাপ্ত হয়েছে। রাধা কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করে বলছেন—

কাজর ভরম তিমির জনু তনুকচি
নিবসই কুঞ্জকুটীর
বাঁশী নিশাসে মধুর বিষ উগারই
গতি অতি কুটিল সুধীর।
সজনি, কানু সে বরজ ভুজঙ্গ।—গোবিন্দ দাস।

আবার রাধাও সর্পিণী ধর্মযুক্তা। কালিয় দমনের পর সখী কৃষ্ণকে বলছে—

মাধব অতএ কহিয়ে তুয়া লাগি।

ত্রিবলিক মাঝ লোম ভুজঙ্গিনী

হেবইতে তুহু জানি ভাগি।

নযন কমলপব যুগল ভুজগবব

কাজব গবল উগাবি

মদন ধন্বন্তবি আপে যব আন্তব

সো বিথ তবহি না সাবি।

বেণী ভুজগবব পিঠপব দোলত

চিবদিন ভুখিল পিয়াসে

শুনইতে নাগ দমন তনুকম্পিত

কহতহিঁ গোবিন্দ দাসে।

কালিয় দমন শুনে বাধাব তনু ভযে কম্পমান কাবণ তিনি নিজেই যেন নাগকন্যা। বাধাব এই অনন্যসাধাবণ বর্ণনাটি পড়ে গোবধন আচার্যেব আবেকটি প্রসিদ্ধ পদেব কথা মনে পড়ে—

কিং পবজীবৈর্দীব্যসি বিস্ময়মধুবাক্ষি গচ্ছ সখি দূবম

অহিমধি চত্ববমুবগগ্রাহী খেলযতু নির্বিঘ্নঃ।

—হে সখি, সাপ খেলা দেখতে দেখতে তোমাব চোখ বিস্ময়ে বিস্ফাবিত হযে মধুবতব হযেছে। অতএব কেন পবেব জীবনকে বিপদাপন্ন কবছ। দূবে সবে যাও, প্রাঙ্গণে সাপুড়ে নির্বিঘ্নে খেলাক। [শ্রীসুকুমাব সেন কৃত অনুবাদ।]

৩

এবাবে মানব সংসাব থেকে সংগৃহীত উপাদানেব কথা বলবো। বৈষ্ণব কবিবা যখন জীবন-বিমুখ নন, প্রাকৃত সংসাবকে অস্বীকাব কবে নয, এরই মধ্যে থেকে অমত্য আনন্দ লাভে প্রযাসী, তখন এটাই স্বাভাবিক যে এঁদেব পদে সাংসারিক প্রতিবেশ ছাযাপাত কববে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের নিত্য কর্মক্ষেত্র সংসারেব পবিচিত দ্রব্যাদি থেকে বৈষ্ণব কবিবা অনেক উপমান সঞ্চয কবেছেন। নিত্যবৃন্দাবনেব সৌন্দর্যলোকে প্রাকৃত

চিত্রকল্পের অতর্কিত সন্নিবেশে রসহানি না হয়ে অনেক ক্ষেত্রে মর্ত্যজীবনের সহজ বাতাস প্রবাহিত হয়েছে। প্রতিদিন আমরা যে-সকল দ্রব্যাদি ব্যবহার করি, যেসব মানুষের সান্নিধ্যে আসি তাদের কথা কবিরা কিভাবে উল্লেখ করেছেন দেখা যাক।

অনেক সময় পদকর্ত্তারা ভোজ্যদ্রব্যের উপমা দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রসাপ্লুতা রাধাকে বলা হয়েছে নবনীতের ন্যায়—লুণীসম দেহ তার রসের সাগরে। এই কাব্যে অন্যত্র রাধার উষ্ণ যৌবনের উপমান তপ্ত দুধ। অতিআগ্রহী কৃষ্ণকে রাধা সতর্ক করে বললেন—

তপত দুধ নালে না পীএ
জুড়ায়িলে সোআদ তাএ।

দধির উপমাও আছে। রায় শেখর রাধার শুভ্রবেশের কথা বলেছেন—মাহিষ দধিরুচির বাস (রূপ গোস্বামীর—পরিহিত মাহিষ দধিরুচি সিচযা স্মর্তব্য)।

গৃহস্থালীর জগৎ থেকে সংগৃহীত আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে ঘটের। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা কৃষ্ণকে তিরস্কার করে বললেন—

যে পুণি আধমজন আন্তরে কপট
তাহার সে নেহা যেহ্ন মাটির ঘট।

এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রাপ্ত অপর উপমার কথা স্মরণ করতে হয়। রাধা নিজের অন্তর্জ্বালার সঙ্গে তুলনা করেছেন মৃৎ পাত্র পোড়াবার চুল্লীর—

মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী।

পদাবলীতে অগ্নিসংক্রান্ত অপর একটি বিচিত্র উপমা পাচ্ছি। জ্ঞানদাস অবিরলধারে বহমান অশ্রুর চিত্র আঁকছেন উনুনে নিক্ষিপ্ত কাঁচা কাঠের তুলনা দিয়ে—

পাবক পরশে সরস দারু যৈছে
একদিশে নিকসই বারি।

পরিচিত গৃহস্থ সংসারের অন্য উপমান স্বর্ণ। সোনার উপমা কখনো কখনো তার দুর্মূল্যতা বোঝাবার জন্য যেমন—

অলপ অধিক সঙ্গে হয় বহুমূল
কাঞ্চন সঞে কাচ মরকত তুল।—জ্ঞানদাস।

স্বর্ণের দুর্লভতা অন্যরূপেও দেখান হয়েছে, প্রেম যেন দরিদ্রের ঘরের সোনা

দারিদঘরে বিহি ররিখযে হেম।—জ্ঞানদাস

দবিদ্রের ধন হেন বাখিতে না পায স্থান
অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরয়ে।—বলবাম দাস।

দাবিদ হেম জনি তিল এক ন ছোডয
বভসে বজনী গমায। —বায় শেখব।

বেবি এক দইব দহিন জঞো হোএ
নিবধন ধন জকে ধবব মোঞে গোএ।—বিদ্যাপতি।

—দৈব একবাব প্রসন্ন হলে দবিদ্রের ধনেব মতো সংগোপনে বাখবো। কিন্তু স্বর্ণেব উপমা প্রকৃত সার্থকতা অর্জন করেছে বাধাব দেহজ্যোতি ফোটাতে। এক্ষেত্রে সোনা শুধু দুষ্প্রাপ্য ধাতু নয়, একটি উজ্জ্বল বর্ণ।

মবকতস্থলি সুতলি আছলি
বিবহে সে খীনদেহা
নিকস পাষানে যেন পাঁচবাণে
কসিল কনকবেহা। —বিদ্যাপতি (?)

মবকত নির্মিত হর্মস্থলে সেই বিবহক্ষীণা নাবী শুযেছিল, মদন যেন নিকষ-পাষাণে কনকবেথা কষেছে।

কেবল সোনা নয, প্রেমকেই অনেক সময সমগ্র পণ্য বিক্রয কার্যেব সঙ্গে তুলনা দেওয়া হযেছে। বিদ্যাপতিব বেশ কয়েকটি পদে পণ্যসামগ্রী পূর্ণ বিপণিব উল্লেখ পাই।

সুনু সুন্দবি নব মদন-পসাব
জনি গোপ আওব বনিজাব।
বোস দবস বস বাখব গোএ
ধএলে বতন অধিক মূল হোএ।

সুন্দবি, শোন, মদনেব নূতন দোকান ঢেকে বেখো না, বণিক আসবে, কোপ দেখিযে বস গোপন রাখবে, কেননা রত্ন ধবে বাখলে তাব মূল্য বেডে যায।

বিফল এ গেলিহু বতন আমোল
চিহ্নিকহু বণিকে ঘটাওল মোল।

অমূল্য রত্ন বেচতে গিযেছিলাম। বণিক (কৃষ্ণ) (বতি—) চিহ্নাঙ্কিত কবে তাব মূল্য কমিয়েছে।

দূরহি রহও মোরি সেবা
পহিল পড়ক্রোক উধারি ন দেবা।

দূর থেকে আমার সেবা গ্রহণ কর, প্রথম বিক্রয় (দ্রব্য) ধারে দেব না। এসকল উপমা প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার স্পর্শযুক্ত।

প্রতিদিনকার চেনা পৃথিবী থেকে নেওয়া আরেকটি চিত্র হচ্ছে 'মন্দির' অর্থাৎ গৃহের। রাধা মন্দির থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন, এই চিত্রটির তাৎপর্য, তিনি কেবল অভিসারে যাচ্ছেন না, সামাজিক সংস্কারকেও লঙ্ঘন করছেন। দ্বার, কপাট প্রভৃতি সামাজিক বিধিনিষেধের প্রতীক।

কুলবতী গৌরব কঠিন কপাট।
গুরুজন নয়ন সকণ্টক বাট।—গোবিন্দ দাস।

কুল মরিযাদ কপাট উদঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠকি বাধা।—গোবিন্দ দাস।

শীল লজ্জা হেমাগার গুরু গৌরব সিংহদ্বার
ধরম কপাট ছিল তায়।—জগদানন্দ।

যেমন গৃহ, গৃহসামগ্রী ও পণ্যদ্রব্যের উপমা তেমনি সাধারণ মানুষের উল্লেখ সমূহও লক্ষণীয়। কত বিচিত্র স্বভাবের ও বহুবিধ বৃত্তিধারী মানুষের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে দেখা যেতে পারে। একটি পরিচিত উদাহরণ হলো ভিক্ষুকের। কৃষ্ণের দৃষ্টি বরনারীর পেছনে পেছনে ধাবমান, কৃপণের অনুগমনকারী যেমন আশা লুব্ধ ভিক্ষুক।

আসা লুবধল ন তেজ এ রে
কৃপণক পাছু ভিখারি।- বিদ্যাপতি।

আবার, সময় অতিক্রান্ত হবার পর প্রার্থনা নিয়ে উপস্থিত বিলম্বিত ব্যক্তিরও প্রতীক ভিক্ষুক—

সাঁঝক বেরি সেব কোই মাগই
হেরইতে তুঅ পদ লাজে।—বিদ্যাপতি।

শুধু ভিক্ষুক নয়, গোবিন্দদাস আর একটি কৌতুককর উদাহরণ দিয়েছেন, লোভী ব্রাহ্মণের ছবি—

মধুগুড় লোভিত বাউল চিত
বন্ধক দেওই যজ্ঞোপবীত।

আর আছে ব্যাধ ও চোরের ছবি। কৃষ্ণের রূপ যেন ব্যাধ—

নন্দের দুলাল চাঁদ পাতিয়া রূপের ফাঁদ
ব্যাধ ছিল কদম্বের তলে
দিয়া হাস্য সুধা চার অঙ্গ ছটা আটা তার
আঁখি পাখি তাহাতে পড়িল।—জগদানন্দ।

চোরের উপমাটি এরকম কোন নির্দিষ্ট অর্থযুক্ত নয়। নানা ভাবকে ব্যঞ্জিত করতে তার প্রয়োগ হয়েছে। যেমন, রাধার ভাবগোপনের চেষ্টাকে বলা হয়েছে 'চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া ফুকারি কাঁদিতে নারে'। আবার কৃষ্ণ নিজেই চোর, যেমন লোচনদাসের পদে—

বেরো লো পাড়ার লোক চোর ঢুকেছে ঘরে
চোরের গলায় ফুলের মালা ঘর মৌ মৌ করে।
না লয় মোর ঘটি বাটি না লয় মোর খুরী
যে ঘরেতে সুন্দরী বৌ সেই ঘরেতে চুরি।

যেসব কৃষ্ণপ্রিয়া রাত্রে দশমদণ্ডে অভিসারে বেরিয়েছেন তাঁরাও চোর—

কাজর রুচিহর রয়নী বিশালা
তছুপর অভিসার করু ব্রজবালা।
ঘরসঞে নিকসয়ে যৈছন চোর
নিশবদ পথগতি চললিহ থোর।—রায় শেখর।

সর্ব্বোপরি যে সকল গুরুজন রাধার প্রেমের বিঘ্ন তাঁদেরও বলা হলো চোর,

হৃদয় মন্দির মোর কানু ঘুমাওল
প্রেম প্রহরী রহু জাগি
গুরুজন গৌর চৌর সদৃশ ভেল
দূরহি দূরে রহু ভাগি।—গোবিন্দ দাস।

এছাড়া রোগের উপমাও পদাবলীতে বিরল নয়। নায়ক চুম্বন করতে চাইলে নায়িকা মুখ নিচু করে রইলেন, রোগী করয়ে যৈছে ঔষধ পান (বিদ্যাপতি?) শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আছে—

বিরহে পুড়িয়া কাহ্ন হাকল বিকল।
জরুআ দেখিআ যেহ্ন রুচক আম্বল।

৪

ওপরে উদ্ধৃত উদাহরণগুলি প্রাকৃত-বিশ্ব-সম্পৃক্ত হওয়ায় বিশেষ একধরণের রসের আস্বাদন ঘটায়। কিন্তু সমগ্র পদাবলী জগতের পটভূমিকায় এদের সংখ্যা অল্প। বৈষ্ণব কাব্যের শ্রেষ্ঠ চিত্রকল্পগুলি পাঠ করলে এই বিশ্বাস ক্রমে প্রগাঢ় হতে থাকে যে মানব সংসার নয়, নিসর্গ সংসারই কবিদের প্রকৃত প্রেরণা স্থল। নদী তরঙ্গ, বনপ্রকৃতি, সূর্যচন্দ্র, গ্রহতারা, মেঘ বিদ্যুৎ বর্ষণ, শীতগ্রীষ্ম বর্ষা —এরাই প্রধানভাবে পুষ্ট করছে বৈষ্ণব কবিদের ভাবজগৎ। পৃথিবীর কর্ম্মমুখর পরিবেশ ও বাস্তবতার অতিস্পষ্ট আলোকে তাঁদের কল্পনা সঙ্কুচিত বোধ করে বলে তাঁরা নিসর্গের দিগন্তবিলীন প্রসার থেকে রাধাকৃষ্ণের লোকোত্তর প্রেমের উপযুক্ত চিত্রোদাহরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

রাধার দেহের বর্ণনা প্রসঙ্গে জল কিংবা জলজবস্তুর উপমান কবিরা অনেক কাল থেকে ব্যবহার করে আসছেন। বিদ্যাপতি লিখছেন—

কূপ গভীর তরঙ্গিণী তীর
জনমু সেমার লতা বিনু নীর।

নদীর অর্থাৎ ত্রিবলীর কূলে এক গভীর কূপ অর্থাৎ নাভি। সেখানে জল না থাকলেও রোমাবলীরূপে শৈবাল জন্মেছে। এরকম দৃষ্টান্ত অপ্রচুর নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে স্ত্রীলোকের যৌবনের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়েছে জোয়ার জলের, তিরীর যৌবন রাতির সপন যেহ্ন নদীকের বাণে। নদীর মতো নারীর অপর উপমান হচ্ছে মেঘ। পদাবলীতে মেঘ নানার্থ ব্যঞ্জক। একটা অর্থ সে তৃষিত ব্যক্তির তৃপ্তি সাধনকারী। নায়ক পিপাসার্ত ব্যক্তির মতো নায়িকার প্রেম প্রার্থনা করলেন -

জলধর জলঘন গেল অসেখি
করএ কৃপা বড় পরদুখ দেখি।—বিদ্যাপতি।

হে মেঘ, এখনো তুমি বর্ষণ করছ না, পরের দুঃখ দেখে মহৎ লোকেরা কিন্তু কৃপা করে। এই বর্ষণময়তা মেঘের একটি ধর্ম্ম। আবার তার অন্য ধর্ম্মও আছে, তা হলো অভিসারে বাধা সৃষ্টি করা।

কাজরে সাজলি রাতি
ঘন ভএ বরিসএ জলধর পাঁতি।
বরিস পয়োধর ধার

দূরপথে গমন কঠিন অভিসার।—বিদ্যাপতি।

রজনী কাজলে সজ্জিত হলো. মেঘদল ঘন বর্ষণ করছে, দূরপথে অভিসারে যাওয়া এখন কষ্টকর।

গগন গরজ ঘন জামিনি ঘোর
রতনহুঁ লাগি ন সঞ্চর চোর।
এহ না তেজি অএলাহু নিঅ গেহ
অপনহু ন দেখিঅ অপনুক দেহ।—বিদ্যাপতি

অন্ধকার রাত্রে মেঘের গর্জন, এমন রাত যে রত্নের লোভে চোরও বার হয় না, অন্ধকারে নিজের দেহ নিজে দেখতে পাই না, এসময়ে নিজগৃহ ত্যাগ করে এলাম। এ দুটি চিত্রে মেঘের মূর্তি অন্ধকারময়। তা পথিকের আনন্দকর নয়, বিঘ্নোৎপাদক। তা ছাড়া মেঘকে অন্যরূপেও ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন অশ্রু কিংবা আর্তি কিংবা দেহবর্ণ বোঝাতে। কৃষ্ণ যখন রাধার জন্য ব্যাকুল, গোবিন্দদাস লিখলেন—

জনু নব জলধর ধরনী লোটায়ত
আকুল চিকুর বিথারি।

অশ্রুঝরা যে দৃষ্টি তারও উপমান মেঘ, যেমন—

ডগমগ দেহ
থেহ নাহি বান্ধই
দুহুঁ দিঠি মেহ
সঘনে বরখনিয়া। বলরাম দাস।

কিন্তু মেঘের অপর যে ব্যঞ্জনা এবং যা নিঃসংশয়ে সর্বোত্তম, ব্যঞ্জনা তা রাধার দেহজ্যোতির পটভূমি হিসেবে। বিদ্যাপতির একটি শ্রেষ্ঠপদে এই ব্যঞ্জনার চরম নিদর্শন পাই—

যব গোধূলি সময় বেলি
তব মন্দির বাহির ভেলি
নব জলধরে বিজুরী রেহা
দ্বন্দ্ব বাঢ়াইয়া গেলি।

এই পদটিতেই প্রথম রাধার রূপকে বিদ্যুতের সঙ্গে উপমিত করে মেঘের পটভূমিতে প্রতিস্থাপনের দ্বারা উজ্জ্বলতর করবার সার্থক উদাহরণ দেখি।

এরপর থেকে পদাবলীতে যেমন কৃষ্ণের নবজলধর কান্তির তেমনি রাধার বিদ্যুৎদীপ্ত রূপশিখার অজস্র উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। সম্ভবত চণ্ডীদাসই অন্ত আদি কবি যিনি এই বিদ্যুতের উপমাটিকে আবেকটি সার্থক রূপ দিয়ে বলেছেন 'থির বিজুরী বরণ গৌরী পেখনু ঘাটের কূলে'। পরবর্তীকালে গোবিন্দদাস একই উপমাকে আরো সংক্ষিপ্ত ও দৃঢ় রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন,

ও নব জলধর অঙ্গ
ইহ থির বিজুরী তরঙ্গ।

কিংবা

তড়িত জড়িত যৈছে নব জলধর।

কিংবা

জলধরে বিজুরি উজোর।

বস্তুত পদাবলী সাহিত্যের মেঘ ও বিদ্যুতের মতো আলো ও অন্ধকারের ঘন ঘন প্রতিতুলনা লক্ষ্য করার মতো। আনন্দ ও বিষাদের ব্যতিক্রম ফোটাতে কবিরা বহুবার আলো ও অন্ধকারের ব্যঞ্জনা এনেছেন। সূর্য্য ও চন্দ্রের উপমানগুলি বিশ্লেষণ করলে একথা বোঝা যাবে। রাধা যেখানে আনন্দিত মূর্ত্তিতে প্রকাশমানা কবি তাঁকে চিত্রিত করেছেন 'অতি অন্ধকারে যেন প্রকাশিত ভানু' (জ্ঞানদাস)। তাঁর কেশপাশে সিন্দুর-বিন্দুটিকে মনে হয় 'সজল জলদে যেন উইল নবসুর' (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন)। সুর অর্থে সূর্য। চন্দ্রের উপমা-গুলিও এরকম। বংশীবদন যখন বলেন 'কপালে চন্দন চাঁদ করিয়াছে আলো' তখন বুঝি চন্দ্র এখানে রূপের স্নিগ্ধতা ও ঔজ্জল্যব্যঞ্জক। এখানে কবি পূর্ণ চাঁদের উপমা দিলেন। চাঁদকে আবার খণ্ডকলা-রূপেও দেখেছেন কবিরা, যেমন—

কিবা সে ভুজুলি শঙ্খ ঝলমলি
সরু সরু শশিকলা।—লোচনদাস।

অনেক নারীর রূপ ফোটাতে চাঁদের বহুত্বের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে—

নব নব নাগরী বালা
যৈছন চান্দকি মালা।—গোবিন্দ দাস।

করু জলকেলি অলি সঙ্গে বালা
হেরলু পথে জনু চান্দকি মালা।—ঐ।

চন্দ্রের কেবল স্থির রূপ নয়, একটি চমৎকার চলরূপও আছে। শ্যামদাস শিশু কৃষ্ণের বর্ণনায় লিখেছেন—

হিয়ার পদক দোলে ঝলকএ কলেবরে
চান্দ যেন চরচর বহে যমুনায়।

অথচ, যখনই কোনো বিষণ্ণ পরিবেশে স্থাপন করা হয়েছে এই চাঁদের উপমাই সম্পূর্ণ অন্যরূপ পরিগ্রহ করেছে। রাধিকা কম্পিত মুখ গোপন করলেন, জ্ঞানদাস বলছেন—বাদরে শশী জনু বেকত না হোই। প্রায় অনুরূপভাবে গোবিন্দ দাসের পদে বলা হয়েছে—

নীলবসন ভিজি অঙ্গে লাগিয়াছে
শ্রীঅঙ্গ দেখিতে উদাস
যৈছে চান্দ কলা মেঘে গরাসল
নিরখই গোবিন্দ দাস।

বিরহখিন্না রাধাও চাঁদের মতো, কিন্তু সে চাঁদ চতুর্দশী তিথির

চৌদশী চাঁদ সমান
মলিনতা ধরলু বয়ান।—জ্ঞানদাস।
ও নিতি চাঁদ কলা সম ক্ষীয়ত
তোহে পুন চড়ব কলঙ্ক।—গোবিন্দদাস।

ক্ষীণচাঁদ অবশ্যই প্রেমের ক্ষয়সূচক, কেন না বিদ্যাপতি বলেছেন সুপুরুষের প্রেম 'দিনে দিনে চন্দ্রকলাসম বাঢ়'।

পদাবলীতে চন্দ্রের এই ব্যঞ্জনা পরিবর্ত্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যে 'শরদচন্দ্র' রাধাকৃষ্ণের মিলনলীলার চিরভ্যস্ত সহচর, রাসের কালে গোপীদের কাছে যে চন্দ্র কৃষ্ণের মতনই অপরিহার্য্য, অভিসারের দিনে তাকেই আবার বৈরী বলে মনে হয় রাধার।

প্রথম প্রহর নিশি জাউ
নিঅ নিঅ মন্দির সুজন সমাউ।
তম মদিরা পিবি মন্দা
অবহি মাতি উগি জাএত চন্দা।—বিদ্যাপতি।

রাত্রির প্রথম প্রহর অতিবাহিত হলে সুজনেরা যাঁর যাঁর শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করলেন। তমোমদিরা পানে মত্ত হয়ে মন্দ চন্দ্র এখনই উদিত হবে। বিদ্যাপতির

অন্য একটি পদে পূর্ণিমায় সারারাত্রি জ্যোৎস্না দেখে রাধা ভাবছেন কাল থেকে আঁধার হবে, অভিসারের বাধা থাকবে না। পূর্ণচন্দ্র এস্থলে নিন্দিত বস্তু।

এই প্রসঙ্গে তারা ও প্রদীপের উপমাগুলির কথাও বিবেচ্য। গোবিন্দদাস রাধার অলঙ্কারের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন 'হার কি তারকা জ্যোতিক ছন্দ'। কবিরা আরো বলেছেন প্রদীপের কথা। জ্ঞানদাসের পদে রাধা আক্ষেপ করে ভাবছেন তিনি কার্ত্তিক মাসে আকাশ প্রদীপের মতো লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—

হম কুলবতী কুলকণ্টক ভেল
কাতিয় রাতি দীপ জনু দেল।

নিস্ফলতা বোঝাতেও দীপের প্রয়োগ রয়েছে, যেমন গোবিন্দ দাসের 'কিয়ে করব কুল দিবস দীপতুল' কিংবা বিদ্যাপতির—

যদি তোহে বরিষব সময় উপেখি
কী ফল পাওব দিবস দীপ লেখি।

এই সকল চিত্রের মধ্যে বিনা দ্বিধায় বলা চলে ঋতু-চিত্রগুলিই সর্বশ্রেষ্ঠ। ভারতীয় কাব্যের একটি পুরাতন ঐতিহ্য ঋতুপ্রীতি। সুতরাং এক্ষেত্রে বৈষ্ণব কবিরা কোনো রীতিগত অভিনবত্বের সূচনা করেননি। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেমের বাতাবরণ রচনায় এই ঋতুচক্র কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে দেখা প্রয়োজন। বিদ্যাপতির একটি সুবিখ্যাত পদে আছে—

শীতের ওঢ়নী পিয়া গিরিষের বা
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না।

এখানে শীত গ্রীষ্ম ও বর্ষা তিনটি ঋতুর কথা আছে। কিন্তু কবিরা বিশেষ ভাবে বলেছেন শরৎ বসন্ত ও বর্ষার কথা। 'ঋতুপতিরাজ বসন্ত'কে অভ্যর্থনা করে বিদ্যাপতি লিখেছেন এই ঋতু 'সময়ক সার'। বসন্তের এরূপ বন্দনা বৈষ্ণবকাব্যে প্রচুর পাওয়া যায় কেননা বসন্ত সম্ভোগাখ্য মিলনের শ্রেষ্ঠ প্রতীক। শরতের চিত্রও কয়েকটি পদে উল্লেখযোগ্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধার বিলাপোক্তিতে আছে—

আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী
মেঘ বহিআঁ গেলেঁ ফুটিবেক কাশী। (অর্থাৎ কাশফুল)।

শরৎ ও বসন্তের ফাঁকে ফাঁকে শীতের ছবিও একান্ত দুর্লভ নয়। গোবিন্দদাস লিখেছেন—

সৌথিনী রজনী পবন বহে মন্দ
চৌদিকে হিমকর হিম করু বন্ধ।
মন্দিরে রহত সবতনু কাঁপ
জগজনে শয়নে শযন কক ঝাঁপ।

শীতের এই পরিবেশে রাধা যখন অভিসারে চললেন তাঁরও শুভ্রদেহ মিশে গেল শুভ্র জ্যোৎস্নায়—

ধবলিম এক বসনে তনু গোই
চললহি কুঞ্জে লখই নহি কোই।

অবশেষে কৃষ্ণকে যখন তিনি পেলেন মনে হল হিমশীতল জলে ডুব দিয়ে রত্ন লাভ করেছেন—

মদন জলধি তলে তহি দেহ ঝাঁপ
মিলল শ্যামতনু থরহরি কাঁপ।

পৌষ রজনীর এই বর্ণনাটি সুন্দর। কিন্তু এদের কোনোটিই বর্ষাবন্দনা পদের সঙ্গে তুলনীয় নয়। বৈষ্ণব কবিরা বর্ষার যে সব চিত্রকল্প প্রয়োগ করেছেন, সূক্ষ্ম ইঙ্গিতধর্মিতায় ও বর্ণৈশ্বর্যে তারা এতই সমৃদ্ধ যে এদের বিশ্লেষণ করা সমালোচকদের পক্ষে প্রায় অসাধ্য। পূর্বে বলা হয়েছে, মেঘ শুধু কৃষ্ণের বর্ণতুল্য নয়, শুধু পিপাসিত পথিকের হৃদয়ে আশ্বাসদায়ক নয়, সে রাধার কাছে কঠিনতম বাধার প্রতীকও বটে। কিন্তু বাধা প্রবল বলেই বোধ হয় তার আকর্ষণও তীব্র, তার বর্ণনায় কবিদেরও উৎসাহ অন্তহীন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, রায়শেখর থেকে শুরু করে প্রথম শ্রেণীর সব বৈষ্ণব কবিই বর্ষার চিত্র এঁকেছেন। জ্ঞানদাসের একটি পদ 'রজনী শাঙনঘন ঘন দেয়া গরজন' রবীন্দ্রনাথের একটি প্রসিদ্ধ কবিতার সঙ্গে জড়িত হয়ে গেছে। এ ছাড়াও এমন বহু পদ আছে যা বারংবার উদ্ধৃতির যোগ্য। সকল ঋতুর মধ্যে বর্ষার প্রভাবই সর্বাপেক্ষা অপ্রতিরোধ্য, বিদ্যাপতির রাধা এই কথা বলে হতাশভাবে জিজ্ঞাসা করছেন, কোকিলকে তাড়িয়ে দিতে পারি, ভ্রমরদলকে করকঙ্কণ ঝঙ্কারে নিবৃত্ত করতে পারি, কিন্তু ধবলগিরি থেকে মেঘ এলে তাকে ফিরিয়ে দেব কোন্ উপায়ে?

খেদব মোঞে কোকিল অলিকুল বারব
করকঙ্কণ ঝমকাঈ—
জথন জলদে ধবলাগিরি বরিসব
তথমুক কওন উপাঈ।

দুর্যোগময়ী রাত্রির তীব্র বিদ্যুৎ বিচ্ছুতির যে প্রতিবেশ থেকে কবিশেখরের—

সখি হে হামার দুখের নাহি ওর রে।
এ ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর রে।

কবিতাটির জন্ম যেখানে, গোবিন্দ দাসের অতুলনীয় চিত্রকল্পটির উৎসও সেখানেই—

মন্দির বাহির কঠিন কপাট
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।
তঁহি অতি দূরতর বাদর দোল
বারি কি বারহ নীল নিচোল।

৫

এখন প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে, এসকল চিত্রকল্পের শিল্পোৎকর্ষ কতখানি। এ পর্যন্ত আলোচনাতে চিত্রকল্পসমূহের প্রধান বৈশিষ্টসমূহ শুধু প্রদর্শিত হয়েছে। স্থায়ীমূল্য কতটুকু তা বলা আবশ্যক।

একটি বিষয়ে সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। আধুনিক কাব্যকলার সঙ্গে পরিচিত পাঠক পদাবলীর চিত্রকল্পের সঙ্গে অনিবার্যত ইদানীন্তন কালের চিত্রকল্পের তুলনা করতে চাইবেন। এই তুলনা অসঙ্গত। ষোড়শ শতাব্দীর কাব্যাদর্শের প্রতি তাতে অবিচার করা হবে। এককালের ভাবানুষঙ্গ অন্যকালে জোর হারাতে পারে, একযুগের পরিধিতে যে শিল্পরূপ স্বীকৃত হয় অন্যযুগে তা হয়তো অনাদৃত হবে। পদাবলীর চিত্রকল্পসমূহের ব্যঞ্জনাও তার স্বকীয় পরিবেশের বাইরে তেমন ক্রিয়াশীল হবে না, এটা স্বাভাবিক। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, গোবিন্দদাসের 'ঘুরি ঘুরি জনু ভ্রমরা বুলে' থেকে জীবনানন্দ দাসের 'সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়' কিংবা শ্যামদাসের 'চান্দ যেন টরটর বহে যমুনায়' থেকে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের—

সেথা পূর্ণিমা চাঁদ ডুব দিয়ে নায়

চাঁদমালা তায় ভাসতে থাকে।—পর্যন্ত চিত্রকল্পের ইতিহাসে কালগত ব্যবধান দুস্তর। আধুনিক জটিল জীবনযাত্রার প্রতীক যে চিত্রকল্প তার সঙ্গে ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব কবিদের প্রযুক্ত চিত্রকল্পের তুলনা একান্ত অসমীচীন।

পদাবলীর চিত্রগুলির তাৎপর্য অবশ্যই তাদের দেশকালগত ও ধর্ম্মগত পটভূমিকায় গ্রহণীয়। তথাপি, যথাসম্ভব অনুকূলতার সঙ্গে এদের বিচার করবার পরেও সমালোচক সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন অত্যধিক পুনরাবৃত্তির ফলে এদের দীপ্তি নষ্ট হয়নি কিনা। চিত্রধর্মী পংক্তিতে যে দ্রুতগতি, যে শাণিত ঔজ্জ্বল্য থাকে, কোনো কোনো পদে তার আকস্মিক স্ফুরণ অবশ্যই আমাদের স্তিমিত প্রায় অনুভূতিকে সজাগ করে তোলে। 'মঝু হেরি সুন্দরী ভরমহি চঞ্চল চকিত চমকি চলি যাই'—গোবিন্দদাসের এই বাক্যটির শেষ চারটি শব্দে একটি তীক্ষ্নতা আছে। উৎসাহী গবেষকদের পক্ষে এরকম আরো উদাহরণ দেওয়া সম্ভব। কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে পরীক্ষা করলে পদাবলীর ক'টি চিত্রকল্পে এরকম তীক্ষ্ন দ্যুতির সন্ধান পাওয়া যাবে তা নির্ভয়ে বলা কঠিন। হাবার্ট রীড ফর্মের আলোচনা করে তার দুটি ভাগ দেখিয়েছেন —organic ও abstract। প্রথম মৌলিক উদ্ভাবন প্রসূত organic form কালক্রমে abstract form এর শৃঙ্খলিত নিয়মে বৈশিষ্ট্যহীন আত্ম-বিসর্জ্জনে বাধ্য হয়। সমালোচকের ধারণা, পদাবলীর অধিকাংশ চিত্রকল্পই প্রাথমিক প্রেরণার গতিবেগ নিঃশেষিত হবার পর নির্ব্বিশেষ পৌনঃপুনিকত্বে শোকাবহ পরিসমাপ্তি লাভ করেছে।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন প্রসঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আখ্যানভাগ এত চমৎকারিত্বপূর্ণ যে প্রথমে তার একটি সারমর্ম্ম দেওয়া ভালো।

সমগ্র কাব্যটি জন্ম, তাম্বুল, দান, ভার, ছত্র, বৃন্দাবন, যমুনা, কালিয়দমন, হার, বাণ, বংশী ও রাধাবিরহ এই কটি খণ্ডে বিভক্ত। জন্মখণ্ডে কৃষ্ণের আবির্ভাবের দৈব কারণ প্রদর্শিত হয়েছে। একদা দেবতারা হরির (নারায়ণ) কাছে গিয়ে প্রার্থনা করলেন কংসের হাত থেকে সৃষ্টিকে রক্ষা করতে। হরি

স্বীকৃত হলেন। দু গাছি সাদা ও কালো কেশ দিয়ে বললেন বসুদেব ও দৈবকীর দুটি সন্তান হবে হলী (বলরাম) ও বনমালী। বনমালী কংসের বিনাশ সাধন করবেন। কংস একথা জানতে পেরে বন্দীকৃত বসুদেব-দৈবকীর সন্তানদের বিনাশ সাধন করতে থাকেন। একে একে ছয়টি শিশু এভাবে নিহত হবার পর সপ্তম গর্ভের সন্তান বলরাম রোহিণীর গর্ভে গিয়ে আশ্রয় লাভ করেন। অষ্টম গর্ভের সন্তান বনমালী জন্মাবার পর জগৎ মায়া দ্বারা আবৃত হলো। বসুদেব নদী পার হয়ে নন্দের গৃহে শিশু কৃষ্ণকে রেখে তাঁদের নবজাত কন্যাকে নিয়ে ফিরে আসেন। কংস এই কন্যাকেও হত্যা করলেন বটে কিন্তু অচিরেই জানতে পারলেন তিনি প্রতারিত হয়েছেন। কৃষ্ণ গোপকুলে বড় হতে লাগলেন। দেবতাদের অনুরোধে স্বয়ং লক্ষ্মী রাধারূপে জন্ম নিলেন সাগর গোয়ালার ঘরে। পুরাণের অনুসরণে কৃষ্ণের জন্মকথা এই পর্য্যন্ত বর্ণনা করে কবি যখনকার কথা বলতে সুরু করলেন কৃষ্ণ তখন পূর্ণ কিশোর।

রাধা নপুংসক আইহনের পত্নী। আইহন কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে বৃদ্ধা বড়ায়ি রাধার তত্ত্বাবধান করে। একদা কৃষ্ণ বড়ায়ির মারফৎ রাধার কাছে গুয়া পান, কর্পূর ও চম্পকফুল পাঠালেন প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ। রাধা কুপিত হলেন তাতে। বড়ায়িকে বলিলেন—

মিছাই আনিলেঁ বড়ায়ি তার ফুল পানে
পরাক লাগিআঁ সে হারাইবে নাক কানে।

ক্রুদ্ধ রাধার হাতে চড় খেয়ে বড়ায়ি অভিযোগ জানাল কৃষ্ণের কাছে। দুজনে স্থির করলেন এর শোধ নেওয়া হবে। একদিন বড়ায়ির পরামর্শে রাধা মথুরার হাটে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে দধি দুগ্ধের ভাণ্ড নিয়ে রওয়ানা হলে পথে কৃষ্ণ দানীরূপে তাঁর পথরোধ করলেন। কৃষ্ণের দানের পরিমাণ শুনে রাধা স্তম্ভিত। এগার বৎসর তার বয়স, কৃষ্ণ তাঁর কাছে দান চেয়েছেন বারো বছরের। কৃষ্ণের আসল দাবী এও নয়, রাধার দেহ। রাধা প্রথমে ক্রোধ প্রকাশ করলেন, বললেন—

পাঁজী পুথী তোহ্মার চিরিবোঁ বাম হাথে।

এবং

যোলশত গোয়ালিনী জাইএ বিকে হাটে

মাগুকিলে কিলাঞা মারিবোঁ তোহ্মা বাটে।

আবার বিনীতভাবে উল্লেখ করলেন তাঁর অল্পবয়স ও প্রেমে অনভিজ্ঞতার কথা।

ফুলের নাঅ কাহ্নাঞিঁ নাহি সহে ভরা।

কিন্তু এসকল যুক্তি কৃষ্ণের মনে রেখাপাত করেনি। তিনি বলে রাধার প্রেম আকর্ষণ করলেন, দেহ সম্ভোগে তৃপ্ত হলেন। রাধা বলেছিলেন 'ইঞ্চলা খাঞা কাহ্ন বার পাড়িবে' অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, ছোট ইঞ্চলা মাছের লোভে কেন ব্রত নষ্ট করবে? রাধার কথাই সত্য হলো। কৃষ্ণ ছোট সুখের আশায় বড় সুখকে ত্যাগ করলেন। নৌকাখণ্ডে পুনরায় কৃষ্ণ খেযানৌকার মাঝির ছলনায রাধাকে সম্ভোগ করলেন।

ইতিমধ্যে রাধা নিজেও কিছুটা আকৃষ্ট হয়েছেন। কৃষ্ণের প্রতি ভারখণ্ড ও ছত্রখণ্ডে তিনি অনেকটা স্বেচ্ছায় সম্মতি দিলেন মিলনে। বৃন্দাবন খণ্ড, কালিয়দমন খণ্ড ও যমুনাখণ্ডে কৃষ্ণকে গোপীদের সঙ্গে বিহারে রত দেখা যায। রাধার সঙ্গে তাঁর প্রেম গাঢ়তর হয়েছে। যমুনাবক্ষে জলকেলির পর হার খুঁজে না পেয়ে রাধা যশোদার কাছে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। বিরক্ত হয়ে কৃষ্ণ ঠিক করলেন রাধাকে শাস্তি দেবেন। মদনের পুষ্পবাণ তিনি নিক্ষেপ করলেন রাধার প্রতি। রাধা মূর্চ্ছিতা হলে কৃষ্ণের ভয়ের সীমা রইলো না। সৌভাগ্যক্রমে কৃষ্ণের স্পর্শমাত্রে রাধার চেতনা ফিরে এলো।

এতদিনে কৃষ্ণ সচেতন হয়েছেন, জীবনে তাঁর বৃহত্তর কর্ত্তব্য অসমাপ্ত রয়েছে। কংস নিধন হয়নি। কৃষ্ণ মথুরায প্রস্থান করলেন। বিরহিণী রাধা আকুল হয়ে প্রতি রাত্রি ব্যর্থ প্রত্যাশায় কাটান। বড়ায়ির চেষ্টায় স্বল্প-কালের জন্য তাঁদের পুনর্মিলন হল বটে, কিন্তু নিদ্রিত রাধাকে ফেলে কৃষ্ণ শেষ পর্য্যন্ত চলে গেলেন চিরকালের জন্য।

সাধারণ কৃষ্ণলীলা কাব্যের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পার্থক্য এত গুরুতর যে নিষ্ঠাবান বহুভক্ত একে বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে নারাজ। অথচ এই কাব্যটি একদিন যে বৈষ্ণব সাহিত্যের অঙ্গ বলে স্বীকৃত হতো বহু কোষ গ্রন্থে এ থেকে সংকলিত পদগুলিই তার প্রমাণ। যে কোনো কারণেই হোক এই কাব্যটি পরবর্ত্তীকালে অনাদৃত হয়। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় এর পুঁথি আবিষ্কার করার পর আজ পর্য্যন্ত আর কোনো পুঁথি পাওয়া যায়নি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কাল, ভাষা, লিপি প্রভৃতি বিষয়ে

কোনো দুজন পণ্ডিত একমত নন। কিন্তু যেকালেরই লেখা হোক ভাষা ও লিপি প্রাচীন কি অর্ব্বাচীন যাই হোক এর সাহিত্যমূল্য বিশেষত আখ্যানরসের উৎকর্ষ যে অসাধারণ তা দেখানো বর্ত্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য। তার আগে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বৈষ্ণবমতবাদের কোন্ বিচিত্র রূপটি ধরা পড়েছে দেখানো যেতে পারে।

২

কৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা এ নিয়ে পণ্ডিতেরা অনেক আলোচনা করেছেন। কৃষ্ণোপাসনার উদ্ভব, প্রবর্ত্তন কাল ও প্রসার ইত্যাদি বিষয়ে ৺আর, জি, ভাণ্ডারকর, ৺হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন, ৺বাণীকান্ত কাকতি, শ্রীযুক্ত এ, ডি, পুশলকর, অধ্যাপক J. Gonda প্রমুখ মনীষীদের আলোচনা থেকে কয়েকটি বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত এই যে কৃষ্ণের আবির্ভাবকাল ১০০০ থেকে ৯০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ। কৃষ্ণ অসাধারণ শক্তিশালী হলেও মানুষই ছিলেন, ধীরে ধীরে দেবপদবীতে আরোহণ করেছেন। পুরাণের যুগে তিনি দেবতা বলে স্বীকৃতিলাভ করেন ও কালক্রমে এক ভক্তিরসাশ্রিত মতবাদের জনক হিসাবে তাঁর নাম ভারতের ঘরে ঘরে ছড়ায়।

বাংলাদেশে কবে থেকে বৈষ্ণব মতবাদ প্রবেশ করে তার কোনো ঐতিহাসিক সন তারিখ নেই। চৈতন্যযুগের বহুপূর্ব্ব থেকে তা' প্রচলিত ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু কতখানি সংঘবদ্ধ ছিল তার রূপ বলা দুষ্কর। তবে, চতুর্থ শতকের শুশুনিয়া-লিপি থেকে শুরু করে পঞ্চমষষ্ঠী-সপ্তম-অষ্টম শতক পর্য্যন্ত প্রাপ্ত লিপি ও পট্টসমূহে গোবিন্দস্বামী, শ্বেতবরাহস্বামী ও কোকামুখস্বামী প্রভৃতি নামের বিস্তর উল্লেখ ও এদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত মন্দিরাদির কথা পাঠ করলে বুঝতে পারি বৈষ্ণব আদর্শ ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যের আবির্ভাবের পর বৈষ্ণব মতাদর্শ বাংলাদেশে চিরস্থায়িরূপে প্রতিষ্ঠিত হলো। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল রয়েছে ভাগবতে। চৈতন্যদেব এসে ভাগবতকে সর্বপ্রধান আসন দিয়ে গেলেন বৈষ্ণব সমাজে। চৈতন্যোত্তর কালে বৈষ্ণব মতবাদে পৌরাণিক আদর্শের প্রভাব নিশ্চিতরূপে বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিন্তু পুরাণগুলিতে কোনো বিশেষ একটি মতবাদ প্রকীর্ত্তিত হয়নি। এরা নিজেরাও নানা মতবাদের সমবায়ে সৃষ্ট। সর্ব্বপ্রাচীন পুরাণ বায়ু থেকে আরম্ভ করে বিষ্ণু, কূর্ম্ম, অগ্নি, পদ্ম, ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রভৃতি বহু পুরাণে কৃষ্ণের প্রসঙ্গ আছে। অথচ সবগুলি পুরাণে একই কথা বলা হয়নি। এটি লক্ষণীয় যে প্রাচীন পুরাণগুলিতে কৃষ্ণের বিভিন্ন প্রেমলীলা, তাঁর সহস্রাধিক পত্নী ও আঠারো হাজার সন্তানের কোনো উল্লেখ নেই। (Aspects of Early Visnuism. P. 156 দ্রষ্টব্য)। এই সকল প্রেমোপাখ্যান নিশ্চয়ই পরবর্ত্তী-কালের যোজনা। হয়তো নিম্নবর্গীয় জনমানসে এর প্রথম স্ফুরণ ঘটে, পরে তা কৃষ্ণলীলার অঙ্গ হয়ে যায়। একেই একজন লেখক বলেছেন Folk Krisnaism . এর প্রভাব।

সে কারণে বাংলাদেশে যে কৃষ্ণ এলেন তাঁরও দুইরূপ। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য-ভেদে তাঁর লীলা দ্বিবিধ। একরূপে তিনি 'মহাভারত নাটক সূত্রধার' অপররূপে 'গোপীশত কেলিকার'। এরমধ্যে মাধুর্য্যরসেরই প্রসার ঘটেছিল বেশি। মাধুর্য্যের ভিত্তি যৌন আবেগ। ভাগবত স্বয়ং এই ধরণের যৌন আবেগকে অতীন্দ্রিয় রসে রূপান্তরিত করেছিল। বাংলাদেশে তাই অতি সহজে অনেক লোকপ্রচলিত প্রেমোপাখ্যান কৃষ্ণের রমণকাহিনী পর্য্যায়ে উন্নীত হলো। ভাগবতের প্রভাবে এই প্রবণতা বাড়া বই কমার সম্ভাবনা ছিলনা।

চৈতন্যের আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই আমাদের দেশে এমন কিছু কিছু ধ্যানধারণা প্রচলিত ছিল চৈতন্য নিজে যাদের বৈষ্ণব ভাবাদর্শের ভেতরে স্থান দিতে ব্যগ্র ছিলেন, একথা মনে করবার হেতু আছে। চৈতন্যের সঙ্গে রায় রামানন্দের সাধ্যসাধনতত্ত্ববিষয়ক সুবিখ্যাত আলোচনাটির কথা অনেকবার বলা হয়েছে। চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে রায় রামানন্দকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে 'সহজবৈষ্ণব'। চৈতন্য-চরিতামৃতে দেখি রায় রামানন্দ ও রূপগোস্বামীর আলাপে।

রায় কহে কহ সহজ প্রেমের লক্ষণ
রূপ গোসাই কহে সাহজিক প্রেমধর্ম্ম। অন্ত্য, ১।

এই 'সাহজিক প্রেমধর্ম্ম' কি বস্তু? 'সহজ বৈষ্ণব' কারা? তাঁরাই কি যারা কখনো কখনো শাস্ত্র-বহির্ভূত পথে পদার্পণ করে এমন সব কথা মেনে নিয়েছেন যা পুরাণসম্মত নয়? গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে এমন কিছু

জিনিষ নাই যা অন্যত্র অপ্রাপ্য। এগুলি সম্ভবত স্থানীয় উপাদান, এদেশের লোক-মানস-সম্ভূত। বহু উপাখ্যান, বহু কিংবদন্তী যা নরনারীর সাধারণ লৌকিক প্রেমের সঙ্গে যুক্ত ছিল, বৈষ্ণব কাহিনীতে পরে অভেদে মিশে গেছে। আরো পরেকার যুগে এরাই আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা লাভ করে উচ্চতর ধর্ম্মসাধনার অঙ্গ বলে স্বীকৃত হয়েছে।

বাংলা দেশে রচিত বৈষ্ণব সাহিত্যে এজাতীয় অপৌরাণিক উপাদান পৌরাণিক কাহিনীর সমান্তরাল ধারায় বহমান। কৃষ্ণের জীবনকথার মধ্যে তাঁর প্রণয়কাহিনীগুলি কেন এদেশে প্রাধান্যলাভ করলে তার কোনো বিশেষ একটি কারণ নেই। তবে তন্ত্রধর্ম্মের প্রসার এর অন্যতম হেতু নিশ্চয়ই। মধ্যযুগে বাংলা দেশে যে তন্ত্রাচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছিল বৈষ্ণবসাধনা তার হাত থেকে মুক্তি পায়নি। এই কারণেই বঙ্গীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে কৃষ্ণের শক্তি-স্বরূপা রাধার স্থান কৃষ্ণের চাইতে কোনো অংশে খর্ব্ব নয়। রাধার নাম প্রাচীন কোনো পুরাণে পাই না, অথচ বাংলার বৈষ্ণবসাহিত্য রাধা-ময়। তন্ত্রের প্রভাবপুষ্ট জনমানসে যে প্রেষ্ঠানারীকে ঘিরে অনেক উপাখ্যান জমেছিল, রাধার মধ্যে তাদের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি অনুমান করে নিলে অসমীচীন হবে না।

পৌরাণিক ও লৌকিক, কৃষ্ণকথার এই দুটি ধারা কি করে সংমিশ্রিত হচ্ছিল বাংলা কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলিতে তার নিদর্শন পাওয়া যায়। ষোড়শ শতকের কাছাকাছি সময় থেকে বাংলাদেশ এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের কদর বেড়ে চলেছিল। ওড়িস্থায় জগন্নাথ দাস, সারল দাস, বলরাম দাস, অচ্যুতানন্দ প্রভৃতি; আসামে শঙ্করদেব, অনিরুদ্ধ কায়স্থ, গোপালচন্দ্র দ্বিজ, জয়রাম, কলাপচন্দ্র, বিষ্ণুভারতী, রত্নাকর মিশ্র, অনন্ত-কন্দলী, কেশবকায়স্থ প্রভৃতি ও বাংলায় মালাধর বসু, রঘুনাথ ভাগবতা-চার্য্য প্রভৃিত কবিবৃন্দ পুরাণসমূহের অনুবাদে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ভাগবত এদের মধ্যে প্রধান ছিল, কিন্তু বিষ্ণু, কূর্ম্ম, অগ্নি, পদ্ম, বিশেষতঃ হরিবংশও যে ব্যাপকভাবে পঠিত হতো তাতে সন্দেহ নেই। মহাপ্রভুর প্রেরণায় বাংলায় ভাগবতের চর্চ্চা বেড়ে যায়। তিনি স্বয়ং রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যকে ভাগবত অনুবাদে উৎসাহিত করেছিলেন এবং মহাপ্রভুর মৃত্যুর পরে রচিত বাংলা কৃষ্ণ-মঙ্গল কাব্যগুলি উত্তরোত্তর শুধু পৌরাণিক আখ্যানের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল।

কিন্তু পুরাতন কৃষ্ণমঙ্গলকাব্যে শুধু পুরাণ কথাই নয় লোককথাও আছে।

দানলীলা, নৌকালীলা প্রভৃতি অপৌরাণিক বিষয়বস্তু এদের একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করে আছে। পরবর্তীকালে যে সব গ্রন্থ স্পষ্টত ভাগবতকে আশ্রয় করে রচিত হয়েছিল তাদের মধ্যেও দানলীলার কাহিনী অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। এই অপৌরাণিক শাখার শ্রেষ্ঠতম প্রতিভূ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। এর আখ্যায়িকাংশ পূর্ব্বে দিয়েছি। কালের গতিতে শ্রীকৃকীর্ত্তনের বক্তব্য ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়ে পড়ছিল। ভাগবতের প্রভাবে লৌকিক কাহিনীর ধারাটি হারিয়ে যাচ্ছিল, তবু একেবারে অবলুপ্ত হযনি। সপ্তদশ শতাব্দীর অদ্ভুত একটি কাব্যে, দীন ভবানন্দের হরিবংশে, পুরাণসম্মত কৃষ্ণকথার বহিরাবরণ ভেদ করে লৌকিক আখ্যায়িকার স্রোত প্রবল বেগে উৎসারিত হযেছে।

৩

বাংলাদেশে প্রচলিত পুরাতন এক লৌকিক কাহিনীব ছাপ রযেছে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে, এ কথা এখন প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। এই তথ্যটির উল্লেখ করা হলো শুধু আলোচনার পূর্ণতার জন্য। আরো কিছু উদাহরণ দিযে মতটিকে আমরা স্পষ্টতর করতে পারি মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেব কবি যে পুরাণগুলির সঙ্গে অপবিচিত ছিলেন তা নয। জন্মখণ্ডে পুরাণকথার তিনি বিশদ ব্যবহাব কবেছেন। অন্যান্য খণ্ডেও অবতাব-বৃন্দের ও অন্যান্য পৌরাণিক আখ্যানের অভ্রান্ত বিবরণ পাওযা যায। তাছাডা গীতগোবিন্দের বহু শ্লোকের অনুবাদও আছে। তবু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পডে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না যে কোনো পুরাণ এব আদর্শ নয। তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, বাণখণ্ডেব কবি পুরাণের বাইরে অন্য কোনো প্রেরণার কাছে ঋণী। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধা ও কৃষ্ণের বহু নামের উল্লেখ থাকলেও যে শ্যাম ও রাই নামে পদাবলী সাহিত্য প্লাবিত এ কাব্যে তার চিহ্নমাত্র নেই। রাধা এ কাব্যে বৃষভানু নন্দিনী নন, তিনি 'সাগর-কোঁঅরী'। তাঁর অষ্ট সখীর বদলে আছেন শুধু এক জন সঙ্গিনী—বড়ায়ি। তাঁর স্বামীর নামও আয়ান নয়, আইহন। এসব লক্ষণ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনত্বসূচক। যে কালেই এ কাব্য লেখা হোক না কেন বৈষ্ণব মতাদর্শের একটি খুব পুরোনো ধারার সঙ্গেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের যোগ যে নিবিড় ছিল তা অকুণ্ঠচিত্তে বলা চলে। এ সমস্ত কারণে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের গুরুত্ব

যে বিশেষভাবে এর অপৌরাণিক আখ্যানের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই ধারণা এদেশে বদ্ধমূল হয়েছে।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের এই বৈশিষ্ট্যের মূল্য কতটুকু? সত্যই কি শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন একমাত্র কাব্য যাতে বঙ্গীয় বৈষ্ণবধর্মের লৌকিক ধারাটির বৈশিষ্ট্য পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হযেছে? অন্য কোন কাব্যে কি আমরা এ সমস্ত উপাখ্যানের সন্ধান পাই না? গভীরভাবে চিন্তা করলে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের এই বৈশিষ্ট্যকে খুব অসাধারণ কিংবা তুলনারহিত বলে মনে হয় না। যে গীতগোবিন্দ থেকে অনেক পদ অনুবাদিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে তাতে এই লৌকিক কাহিনীর স্ফুরণ অনেক আগেই ঘটেছিল। একজন লেখক মন্তব্য করেছেন 'the Gita-Govinda...appears to be the first public utterance in dignified language of a cult that must have been struggling for expression amongst the common people for agest (Visnuite myths and legends, P. 86) তা ছাড়া, অনুরূপ আখ্যাযিকার আভাষ বিদ্যাপতির কোনো কোনো কবিতায়ও পাওয়া যায়।

পদাবলীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের একটি বড় পার্থক্য এই যে বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে রাধা প্রথমাবধি কৃষ্ণগতপ্রাণা নন। কৃষ্ণ জোর করে তার প্রেম আকর্ষণ করেছেন। 'এগার বৎসরের বালী যেহ্ন নলিনী দল কোঁঅলী' রাধা কৃষ্ণের পীড়ন থেকে যেভাবে আত্মরক্ষাব চেষ্টা করেছেন তা পদাবলীর তুলনায় অভিনব। কিন্তু নায়িকার এই বিমুখ ভাবটি বিদ্যাপতির পদেও আছে।

কত অনুনয় অনুগত অনুবোধি
পতিগৃহ সখিহি সুতাওলি বোধি।
বিমুখি সুতলি ধনি সুমুখি ন হোএ
ভাগলদল বহুলাব এ কোএ।
বালমু বেসনি বিলাসিনি ছোটি
মেল ন মিলএ দেলহু হেম কোটি।
বসন ঝপাএ বদন থর গোত্র
বাদরতর সসি বেকত ন হোএ।
ভুজ জুগ চাঁপ জীব জোঁ সাঁচ
কুচ কঞ্চন কোরী ফল কাঁচ।

কত অনুনয় করে, কত সান্ত্বনা দিয়ে, অনুগত হয়ে সখিগণ নায়িকাকে স্বামীগৃহে শয়ন করালো, সে বিমুখ হয়ে শুয়ে রইলো। যে (সেনা—) দল পালিয়েছে কে তাদের ফেরাতে পারে? প্রিয় কামুক আর প্রিয়া অল্পবয়স্কা। কোটি সুবর্ণমুদ্রা দিলেও বালিকা মিলন চায় না, মুখ বস্ত্রে ঢেকে রাখে যেন মেঘের নিচে চন্দ্র। সোনার পয়োধর দুহাতে প্রাণের মতো রক্ষা করে। (মজুমদার ও মিত্র সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলী, ৫৯ সংখ্যক কবিতা)। তাম্বুলখণ্ড শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের অপর অভিনবত্ব। বিদ্যাপতির পদে এটিরও আভাস আছে—'কত জতনে দূতী পঠাওল আনা আ গুয়া পান' (ঐ, ৪ সংখ্যক)। নৌকালীলার কথাও পাই তাঁর পদে (ঐ ৩৫১ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য)।

পক্ষান্তরে, বড়ু চণ্ডীদাসের সমসাময়িক কিংবা পরবর্ত্তীকালের আরো বহু কবির যেমন মাধবাচার্য্য, দুঃখী শ্যামদাস, দৈবকীনন্দন সিংহ, পরশুরাম চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণদাস প্রভৃতির কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে এবং গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস প্রভৃতির পদে দান-নৌকালীলার এমন বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে যা সম্পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুরূপ। সুতরাং কৃষ্ণ সংক্রান্ত উপাখ্যানের লৌকিক শাখাটির পূর্ণাঙ্গ চিত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পাওয়া গেছে শুধু এই কারণে গ্রন্থটিকে মূল্যবান বিবেচনা করলে ভুল হবে। এই গৌরব শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের খুব বড় গৌরব নয়। তার যথার্থ মূল্য শিল্পগত উৎকর্ষে।

৪

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রধান চরিত্র তিনটি—কৃষ্ণ, রাধা ও বড়ায়ি। এ ছাড়া একবার শুধু অল্পক্ষণের জন্য বলরামকে দেখা যায় ও অনেকবার যশোদাকে দেখি কৃষ্ণকে তিরস্কার করতে—

> বাছা সব বুলে কাহ্নাঞিঁ নানা থানে থানে
> তোহ্মে ত বুলহ পুতা রাধার কারণে।

কিন্তু যশোদা কিংবা বলরাম প্রকৃত চরিত্রের পর্য্যায়ে পড়েন না। কৃষ্ণ, রাধা ও বড়ায়ির চরিত্র বিকাশেই বড়ু চণ্ডীদাস সর্ব্বাধিক সাফল্য অর্জন করেছেন।

কৃষ্ণ এ কাব্যের নায়ক। কাহিনীর আদ্যন্ত তিনি উপস্থিত, তাঁকে কেন্দ্র করে ঘটনাধারার আবর্ত্তন। দুর্ভাগ্যবশতঃ, তা সত্ত্বেও এত অন্তর্বিরোধ ও অসঙ্গতিতে পূর্ণ তাঁর চরিত্র যে তাঁকে নায়ক বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠা হয়।

তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ পৌরাণিক চরিত্রের বেশে, অথচ অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর সে বেশ ছদ্মবেশ বলে সন্দেহ হতে থাকে। তাম্বুলখণ্ডে তাঁর মূর্ত্তি এক অমার্জিত কামপরায়ণ গ্রাম্য যুবকের। কাহিনীর শেষ অবধি এই গ্রাম্যতা তাঁর চরিত্রে লিপ্ত হয়ে আছে। দানখণ্ডে যেভাবে তিনি রাধাকে সম্ভোগ করেছেন, যে কোন সুস্থ রুচিসম্পন্ন লোকের পক্ষে তা বিতৃষ্ণাকর। রাধার প্রেম তিনি দাবি করলেন, সে দাবির পেছনে সবচেয়ে বড় যুক্তি শারীরিক বলের। রাধার সঙ্গে তর্ক যুদ্ধে তাঁর যুক্তিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চ ধারণা হয় না। সর্ব্বোপরি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কৃষ্ণ একজন নিকৃষ্টচেতা কাপুরুষ। বিশ্বজনের কাছে রাধা যখন পদস্খলিতা, কৃষ্ণ তাঁকে ত্যাগ করে চলে এসেছেন। কংস-নিধনের উদ্দেশ্যে তিনি মথুরায় প্রস্থান করেছিলেন, কিন্তু কংসবধ মনে হয় উপলক্ষ মাত্র। বাণখণ্ডে রাধার প্রতি তিনি বাণনিক্ষেপ করা মাত্র রাধা হতচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। কৃষ্ণ তখন অসহায়ের মতো ক্রন্দন করেছেন। এ সমস্ত দেখে কোন পাঠকের মনে যদি সংশয় জাগে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণ কি কাহিনীর নায়ক, অথবা তিনি কি খল-চরিত্র মাত্র, তাহলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। বস্তুত, এই বাকসর্ব্বস্ব ব্যক্তিটি শুধু ঘৃণ্য নন, হাস্যাস্পদও বটে। নিজের অপকর্ম্মকে শাস্ত্র-বচনের দ্বারা সমর্থনের হাস্যকর প্রয়াস করেছেন তিনি। তাঁর যুক্তির অন্তঃসারশূন্যতা দেখিয়ে রাধা তাঁকে মর্মান্তিক বিদ্রূপে বিদ্ধ করে বলেছেন—

তোহ্মে রাখে আল জনে কড়া চারী কড়ী ধনে
আপণাক জানহ ঈশরে।

কিংবা—

বিহা করিতেঁ না জুআএ হঅ তোহ্মে যোগী।

কৃষ্ণের চরিত্রে একটি গতিশীলতা ও প্রাণময়তা আছে সত্য; কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মের কেন্দ্রস্থলে কৃষ্ণচরিত্রের যে সমুন্নত আদর্শ বিরাজমান তার এই কালিমালিপ্ত বিকৃত প্রতিমূর্ত্তিকে কোনো শিল্পকলার অনুশাসনেই সমর্থন করা যায় না!

অপরপক্ষে, কৃষ্ণের তুলনায় রাধা চরিত্রের বিশিষ্টতা উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে। তাঁর চরিত্রে প্রাণের ঐশ্বর্য্য, অনুভূতির গভীরতা ও জটিল মানসিক সংঘাত চমৎকার সংমিশ্রিত হয়েছে। জীবনের মৌলনীতির প্রশ্নে এই দুই চরিত্রের দুরকম প্রতিক্রিয়া থেকে তাঁদের স্বভাবগত পার্থক্য স্পষ্ট প্রতীয়মান

হয়। একজন ইন্দ্রিয় কামনায় নিমগ্ন, আরেকজনের দেহে মনে তার কোনো স্পর্শ নেই। এমনকি তাঁদের কথা বলার ভঙ্গিতেও এই পার্থক্য ছায়া ফেলেছে। কৃষ্ণ বারংবার সদম্ভে নিজেকে 'ত্রিদশের নাথ' বলে ঘোষণা করেছেন। রাধা একবারও স্বীকার করেননি তাঁর দেবত্ব। কৃষ্ণের উক্তি শুনে প্রতিবাদ করে রাধা বলেছেন—

রাখোআল ছআঁ জগতনিবাস
সুণিআঁ করিব তোরেঁ লোক উপহাস।

রাধার এই স্বর্গবিমুখতা লক্ষণীয়. তিনি সত্যকার মর্ত্তনারী, of the earth earthy.

প্রথম দৃষ্টিতে রাধাকে কে কৃশাঙ্গী ও দুর্ব্বল মনে হয়। তিনি 'শিরীষ কুসুম কোঁআলী, তাঁর মুঠি এক মাঝা বাএ হালে'। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যতই কোমল মনে হোক তাঁকে তাঁর চিত্তধাতুতে দৃঢ়তার অভাব ছিল না। বড়ায়ি তাঁকে কৃষ্ণের প্রেরিত প্রেমোপহার নিবেদন করলে—

কোপে গবজিলী রাধা যেন কালসাপ।

তাঁর প্রত্যাখ্যানের তীব্রতা দেখে ভীত হয়ে বড়ায়ি বলেছিল—

হাণে কুলে এখো নাহিঁ পাটাবুকী তিরী।

কৃষ্ণের কামুকতার প্রতি রাধার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না। তাঁর রূপে উন্মত্ত কৃষ্ণকে যে তিনি প্রতিরোধ করতে পারেননি তার কারণ তাঁর দৈহিক সামর্থ্যের অভাব।

কাহিনীর মধ্যপর্য্যায় থেকে রাধাচরিত্রে পরিবর্ত্তন শুরু হয়েছে। কিন্তু সে পরিবর্ত্তন অতিশয় সূক্ষ্ম এবং প্রায় অবোধগম্য। কিছুকাল প্রেম ও ঘৃণার দোলাচলতা ভোগ করে ধীরে ধীরে তিনি কৃষ্ণের প্রতি উন্মুখ হয়েছেন। ভার-ছত্রখণ্ডে এই নবজাগ্রত প্রেমের অস্ফুট আভাস পাই। অবশেষে বৃন্দাবনখণ্ডে কৃষ্ণের প্রতি তাঁর অনুরাগ স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশিত হলো। রাধা চরিত্রের এই পরিবর্ত্তন ধারা অনুসরণে চণ্ডীদাস যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তার দ্বিতীয় উদাহরণ নেই। বিশেষতঃ শেষাংশ রাধার বিরহাবস্থায় চিত্রটি অপরূপ। এত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন একটি বালিকা, যার প্রতিটি উক্তি পরিহাসের দ্বারা শাণিত, বিবেক যার নির্ঝরের মতো স্বচ্ছ তাঁকেও কৃষ্ণের জন্য হাহাকার করতে হয়েছে। তাঁর জীবনে এই দুঃখই সবচেয়ে

শোচনীয় যে তিনি একদিন কৃষ্ণকে বলেছিলেন—

চূণ বিহনে যেহ্ন তাম্বূল তিতা
আলপ বএসে তেহ্ন বিরহের চিন্তা।

অথচ তিনি নিজেই বিরহে বিবশ হলেন। আর, আশ্চর্য্যের বিষয়, এই তীব্র প্রেমোন্মত্ততার মধ্যেও তিনি কখনো কখনো গভীর অনুতাপের সঙ্গে বলেছেন—

যে পরপুরুষ সমে নেহা করে
তার হএ হেন গতী।

রাধার অপূর্ব্ব মানসিক জটিলতা ও ভাবদ্বন্দ্বের পাশাপাশি রেখে বিচার করলে বড়ায়িকে সত্যকার চরিত্র বলে স্বীকার করা কঠিন। এ যেন বর্গচরিত্র মাত্র। নবম শতাব্দীর দামোদর গুপ্ত কিংবা চতুর্দশ শতকের জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্য্য কুট্টনী নারীর যে চিত্র এঁকেছেন তার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বড়ায়ির বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। এমন কি বড়ু চণ্ডীদাস বড়ায়ির দৈহিক আকৃতির যে বর্ণনা দিয়েছেন—

মাহাপুট নাসা দন্তহীনে
উন্নতগণ্ড কপোলখীনে। ইত্যাদি

তারও সঙ্গে বিদ্যাপতির দূতীবর্ণনার মিল সুস্পষ্ট। তবু দু'একটি স্থলে অন্য সব দূতী চরিত্রের সঙ্গে এর কিছু ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়।

বড়ায়ি শুধু দেখতেই বৃদ্ধ নয়, তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারও বিস্তৃত। কৃষ্ণ বলেছেন—

বিথর দেখিলেঁ বিথর শুণিলেঁ
বিথর তোর বএসে।

প্রথম দর্শনে তাকে নিরীহ ভ্রম হয়, কিন্তু তার স্বভাব যে কুটিল, রাধা অত্যল্পকালের মধ্যেই তা বুঝতে পেরে বলেছিলেন—

বুলী চোর পৈসে ঘরে গিহ্নীক সম্বর করে
হেন দুঠ বড়ায়ির বাণী।

তবু এটি বড়ায়ির একমাত্র রূপ নয়। তার অন্তরে রাধার জন্য অকৃত্রিম স্নেহও ছিল নিশ্চয়ই। বিরহ দশায় রাধাকে আন্তরিক হিতাকাঙ্ক্ষায় আবৃত করে রেখেছিল বড়ায়ি। তার চরিত্রে এই ভাবদ্বৈধটি লক্ষণীয়, কেননা এই দুই ভাব থেকে পরবর্ত্তীকালে সম্পূর্ণ বিজাতীয় দুটি উত্তরাধিকারী জন্মেছিল তার।

বড়ায়ি চরিত্রের একটি দিক পরিণতি লাভ করেছে ভাবগাম্ভীর্যমণ্ডিত পৌর্ণমাসী চরিত্রে, অপরদিক হাস্যোদ্দীপক জরতীরূপে।

৫

চরিত্রসৃজনে বড়ু চণ্ডীদাস কতখানি দক্ষতা দেখিয়েছেন অন্যান্য কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের সঙ্গে তুলনা করলে তা বুঝতে পারি। মালাধর বসু কিংবা রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের কাব্যে কৃষ্ণ কোনো চরিত্র নন, একটি পৌরাণিক নাম মাত্র। মাধব আচার্য্য কিংবা দুঃখী শ্যামদাস কিংবা দৈবকীনন্দন সিংহের কাব্যে কৃষ্ণ ও রাধা সচল কিন্তু সজীব নন। দীন ভবানন্দের কাব্যে রাধা ও কৃষ্ণ এর চেয়ে বেশি পরিস্ফুট অবশ্য, কিন্তু সে কাব্য এত স্থূল হস্তের সৃষ্টি যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সঙ্গে তার তুলনা অসঙ্গত। একদা যিনি ছিলেন ঐতিহাসিক মানব, যুগ-যুগান্তরের ভক্তিপ্রলেপে তাঁর মানুষীমূর্ত্তি বহুকাল আগেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। পুরাণগুলিতে কৃষ্ণকে মানবরূপে পাইনা ; পুরাণের প্রভাবে সৃষ্ট কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যেও কৃষ্ণ ধূসর ছায়ামূর্ত্তির মতো। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পড়ে এই কারণে চমক লাগে যে কৃষ্ণ ও রাধা অকস্মাৎ এতদিনের সঞ্চিত ধূলি ঝেড়ে সহজ মানুষের মতো চলাফেরা করছেন। তাঁদের দেবত্বে সংশয় প্রকাশ করতে পারি কিন্তু তাঁদের মানবত্ব অবিসংবাদিত।

অহৈতুকী ভক্তির চিরাভ্যস্ত সংস্কার ত্যাগ করায় রাধা ও কৃষ্ণ যেমন প্রাকৃতজীবনের কাছাকাছি এসেছেন, কবির ভাষাও তেমনি দৈনন্দিন উক্তি প্রত্যুক্তির স্পর্শে জীবন্ত। এমন শব্দ কবি ব্যবহার করেছেন যা অব্যর্থ অথচ শিষ্ট নয়। এমন চিত্রকল্পের সৃষ্টি করেছেন যা ধূলিমাটির জীবনের সঙ্গে জড়িত। বড়ায়ির আনা তাম্বূল দেখে রুষ্টা রাধা যখন বলেন—

এহা গুআ পান তোহ্মে আপনেই খাহা
আপনাক চিহ্নিআঁ কাহ্নের থান যাহা।

তখন তাঁর ভাষা ঠিক ভক্তিরসাশ্রিত কাব্যের নায়িকার উপযুক্ত বলে মনে হয় না। কিন্তু এই ভাষাই রাধার মানবত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের উপমাদিতে কবির বাস্তবমুখী মনের পরিচয় আরো স্পষ্ট।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের চরিত্রসৃষ্টিতে কবির একটা সিদ্ধি লাভ ঘটেছে আরো এক কারণে। কাব্যটি গঠনশিল্প বিশ্লেষণ করলে তার নির্দ্দেশ পাই।

কাব্যটি মঙ্গলকাব্য। 'মঙ্গল' শব্দটি আধুনিক কালে শুধুমাত্র মৌলিক দেবদেবীর মহিমাখ্যাপক কাব্যের প্রতি প্রযুক্ত হচ্ছে। এই প্রয়োগ যথার্থ নয়। মূলতঃ মঙ্গল বলতে একধরণের গান বোঝা'ত সন্দেহ নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বলা হচ্ছে—

সব গোআলিনী যাএ বড়ায়ির সঙ্গে
লাস হাস পরিহাস করি নানা রঙ্গে।
ষোলশত গোপীজন করি কোলাহল
জাইতেঁ হরষিত মনে গায়িতেঁ মঙ্গল।

পরবর্ত্তীকালে মঙ্গলের অর্থ দাঁড়িয়েছিল এক ধরণের দীর্ঘ কাব্য যার কোনো কোনোটি নাচ গান সহযোগে পরিবেশিত হতো শ্রোতাদের কাছে। একজন মূল গায়ক সঙ্গে দোহার কিংবা পালি নিয়ে মৃদঙ্গ মন্দিরা সহযোগে আবৃত্তি করে শোনাতেন কাব্য। এরকম অভিনয়তুল্য আবৃত্তির ঈষৎ আভাস রয়েছে জাগের গান, কুশল গান কিংবা অসমীয় ওঝা পালিতে, আর এরই অপেক্ষাকৃত জটিলতর রূপ হচ্ছে ঝুমুর নাচ। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সঙ্গে ঝুমুরের সাদৃশ্য স্পষ্ট। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদগুলি বিশ্লেষণ করে শ্রীসুকুমার সেন দেখিয়েছেন এরা লাচাড়ী ও লগনী দুটি মুখ্য ভাগে বিভক্ত (বিচিত্র সাহিত্য, ১ম খণ্ড)। লাচাড়ী বর্ণনাত্মক, লগনী উত্তর প্রত্যুত্তরযুক্ত নাটকধর্মী আলাপ, জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্য যাকে তাঁর বর্ণনরত্নাকরে লগনী নাচো বলে নির্দ্দেশ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের একটি বড় অংশ লগনী মূলক, অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ-বড়ায়ির উক্তি প্রত্যুক্তির ওপর গঠিত। কাহিনী রচনার এই বিশেষ ভঙ্গিটি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের শিল্পকলাকে কতদূর নিয়ন্ত্রিত করেছে ভেবে দেখা উচিত। ভঙ্গিটি নাটকীয় বলে একদিকে যেমন চরিত্রগুলি খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, অতি-প্রত্যক্ষ ও শরীরী মনে হয় তাদের, অপর দিকে গল্পের গতিতেও কোনো শ্লথতা সঞ্চারিত হতে পারেনি। এই বিশিষ্ট রূপকল্পটি অবলম্বিত না হলে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন থাকতো কিনা সন্দেহ।

লগনীগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠ অংশ। কিন্তু লাচাড়ী অংশেও অপর এক ধরণের সৌন্দর্য্য রয়েছে। বাস্তবানুগ বর্ণনাকে যদি কথাশিল্পের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় অংশ বলে স্বীকার করা হয় তাহলে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দুয়েকটি বর্ণনা লক্ষণীয়। কবি রাধা চরিত্রের বিকাশ খুব সূক্ষ্মভাবে এঁকে দেখিয়েছেন।

দুর্বোধ্য নারীমনের এই বিশ্লেষণে, তাঁর প্রাথমিক বিমুখতা ও পরেকার ঐকান্তিক প্রেমব্যাকুলতার মধ্যবর্ত্তী সংখ্যাতীত স্তরকে বড়ু চণ্ডীদাস যে নিপুণতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তা বিস্ময়কর। নারীর অন্তর্জ্জগতের ভাববৈচিত্র্য, তার পরিহাসশীলতা ও আধিপত্যপ্রিয়তার এক একটি খণ্ড চিত্রকে এককালে উপন্যাস-শিল্পের সমতুল্য মনে হয়। কৃষ্ণকে রতি সম্ভোগের আশা দেখিয়ে ভার বহনে সম্মত করে রাধা মথুরার পথে যাত্রা করলেন—

দধিভার লআঁ কাহ্ন মথুরাক জাএ
উলটি উলটি রাধা কাহ্নপাণে চাহে।

কৃষ্ণের দুর্গতি রাধা নিঃশব্দে উপভোগ করছিলেন। আবার রাধা নিজেই যখন মনে মনে কামনার দ্বারা চঞ্চল তার বাহ্য লক্ষণগুলির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে এরকম—

বৃন্দাবন জাএ রাধা রস পরিহাসে
আড় নয়নে দেখে কাহ্নঞিঁক পাশে।
খসাআঁ বান্ধিল পুণী কুন্তলভার
সঘন ছাড়িল রাধা হাস্বী অপার।
চুম্বন করিল রাধা সখীর বদনে
ভাল গীত গাএ বুলী পাড়িল মদনে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের শিল্পগত উৎকর্ষ বহুলাংশে নির্ভরশীল এর বাস্তবধর্ম্মী চিত্রাবলীর ওপর।

সকল বৈষ্ণব কাব্যই কৃষ্ণের অলৌকিক মাধুর্য্যের ইঙ্গিত দেয়, যেমন পদাবলী তেমনি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। কিন্তু শুধু এই কারণে পদাবলী ও শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের বিচার একই মানদণ্ডে হতে পারে না। রূপকল্পের ভিন্নতার ফলে দুটির বিচারের মানদণ্ডও পৃথক হয়ে গেছে। পদাবলীর রস গীতিকাব্যের, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রস আখ্যানগত। আখ্যায়িকা গঠনের নিয়মাবলীতে এই কাব্যের বিচার সঙ্গত বলে এর রূপকল্পের বৈশিষ্ট্য আমরা বিস্মৃত হতে পারি না। বর্ণনাময় এর আখ্যান একে দ্রুতগতি দান করেছে নাটকীয় উক্তি প্রত্যুক্তিময় অংশগুলি। আর এই আখ্যান কৃষ্ণলীলার অন্যান্য আখ্যান থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছে এর বাস্তবাভিমুখিতার ফলে। মর্ত্তজগতের দিকে ঝুঁকে পড়ায়

শুধু অলৌকিকতার রুদ্ধশ্বাস পরিমণ্ডল থেকে এ কাব্য বার হয়ে এসেছে এই নয়, এর ভাষায় ও বিষয় বস্তুতে অশ্লীলতার স্পর্শ পর্য্যন্ত লেগেছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অশ্লীলতার সমর্থনে অনেক প্রকার যুক্তির অবতারণা সম্ভব। হয়তো এটি তৎকালীন সামাজিক আচরণের দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু এ সমস্ত যুক্তি গৌণ। শিল্পগত কারণেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের এসব অনৈতিক উপাদানকে মেনে নিতে হয়। যে কোনো শিল্পবস্তু ধরা যাক, তার একটি সামগ্রিকতা আছে। যদি এতে এমন কিছু থেকে থাকে যা এই সামগ্রিকতাকে, মৌল কল্পনার অবিভাজ্যতাকে ব্যাহত করে তবে তা শিল্পকলার বিচারে নিন্দনীয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বিচারেও আমাদের ভেবে দেখতে হবে এর নীতিবিগর্হিত ঘটনাগুলি কি বাইরে থেকে প্রক্ষিপ্ত, অথবা কোনো গূঢ়তর প্রবর্ত্তনায় মূল কাহিনীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের তথাকথিত অশ্লীল অংশগুলো ত্যাগ করলে রাধা ও কৃষ্ণ চরিত্রের কতটুকু প্রাণময়তা অবশিষ্ট থাকে তা ব্যাখা করে বলা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

৬

পূর্ব্বে বলেছি, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বিষয়ে পণ্ডিত মহলে প্রশ্নের অন্ত নেই। এ কাব্য কবেকার লেখা? ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এক সময় মতপ্রকাশ করেছিলেন এটি গীতগোবিন্দের পূর্ব্বে রচিত। শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন এর ভাষা ১২০ থেকে ১৫০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী। লিপি বিচার করে ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন এটি চতুর্দশ শতকের গোড়াতে রচিত। শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাকের মতে এর রচনাকাল ১৪৫০ থেকে ১৫০০ খৃষ্টাব্দ। ৺যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বলতেন, রচনাকাল নিশ্চয়ই ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের পরেকার। শ্রীসুকুমার সেনের মতে এটি সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকের গোড়াতে লিখিত। এর মধ্যে কোন্ তারিখটি পাঠক গ্রহণ করবেন? পুঁথিটিকে সাধারণতঃ খুব প্রাচীন বলে মনে করা হয়। বর্ত্তমান লেখক পুঁথি বিচার করে এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি। তবে, পুঁথি যাই হোক, ভাষা দেখে, কৃষ্ণের চরিত্র দেখে, বৈষ্ণব মতবাদের যে রূপটি এখানে প্রতিফলিত হয়েছে তার বিচার করে হয়তো বলা যায় একাব্য ১৫০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে লেখা হওয়া সম্ভব। আবার কবির পরিচয় নিয়েও দ্বন্দ্ব আছে। ইনি কোন্

চণ্ডীদাস? 'লঘু বৈষ্ণব তোষণী' নামক টীকায় জীবগোস্বামী দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড রচয়িতা যে শ্রীচণ্ডীদাসের উল্লেখ করেছেন ইনি কি সেই কবি? রায় রামানন্দের সঙ্গে বসে মহাপ্রভু জয়দেব ও বিদ্যাপতির কাব্যের মতো যে চণ্ডীদাসের কাব্য পড়েছেন বড়ু চণ্ডীদাস কি তাঁরই নাম? ভক্ত বৈষ্ণবেরা একথা স্বীকার করেন নি। অথচ গীতগোবিন্দ পাঠের পর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন আস্বাদন মহাপ্রভুর পক্ষে কেন নিষিদ্ধ হবে বোঝা দুষ্কর। অর্থাৎ এ সমস্ত জিজ্ঞাসার কোনো একটি বিষয়ে সর্ব্বজনগ্রাহ্য সদুত্তর দেওয়ার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র।

কিন্তু এসব প্রশ্নের সমাধান না হলেও ক্ষতি নেই। যে কালেই লেখা হোক শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (ধরা যাক অষ্টদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে), যিনিই হোন না কেন বড়ু চণ্ডীদাস (ধরা যাক এটি ছদ্ম নাম), অন্তত একটি বিষয় নিশ্চিত যে অন্য কোনো কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে আখ্যানরস এত পরিপুষ্ট নয়। বড়ু চণ্ডীদাস নিজেকে বাসলীর সেবক বলেছেন। এর অর্থ নিষ্ঠাবান পদকর্ত্তা মহাজনদের সগোত্র তিনি ছিলেন না। রাধাকৃষ্ণ সম্ভবতঃ তাঁর কাছে শুধু মাত্র কাহিনীর উপজীব্য বিষয় ছিলেন। হয়তো এই কারণেই অন্য ভক্ত কবিদের মতো কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের সংকীর্ণ বৃত্তের মধ্যে পরিভ্রমণ না করে তিনি গতানুগতিক জগতের বাইরে, পদক্ষেপ করেছিলেন।

চৈতন্য চরিত ও কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে সমাজচিত্র

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের যে সকল নিদর্শন বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত পাওয়া যায় তার সাহিত্যিক মূল্য বিষয়ে সকলে নিঃসন্দেহ নন। কিন্তু এ সকল গ্রন্থের মধ্যে অতীত কালের বাংলা দেশ সম্বন্ধে নানা মূল্যবান তথ্য যে লুকিয়ে আছে সে বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ কম। বাংলা দেশের সামাজিক ইতিহাস রচনায় সেই সব গ্রন্থের সহায়তা প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করা হয়ে থাকলেও আরো বিস্তৃত অনুসন্ধান প্রয়োজন। বর্তমান আলোচনায় বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা নিয়ে শুধু চর্চা করা হবে। সমগ্রভাবে সমাজ জীবনের পরিচয় উদ্ঘাটনের কাজে এই শাখাটিতে বিধৃত উপাদান-সমূহ সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

উপাদান

মধ্যযুগের সুবিস্তৃত বৈষ্ণব সাহিত্যের কিছু অংশের উপর ভিত্তি করে বর্ত্তমান আলোচনা প্রস্তুত করা হয়েছে। জয়দেবে যার সূত্রপাত, বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাসের সাধনায় পুষ্ট হয়ে ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর তা বিপুল আকার ধারণ করে। বৈষ্ণব সাহিত্যই যে মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে মুখ্যস্থান অধিকার করেছিল, তা অবিসংবাদিতভাবে সত্য। সেই সাহিত্যের যে সকল অঙ্গ বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে গৃহীত হয়েছে তাদের কথা বলা যাচ্ছে।

ক। চৈতন্য জীবনী

বাংলায় বৈষ্ণবদের একটি অক্ষয়কীর্তি জীবনী রচনার প্রথা প্রবর্ত্তন। সাধারণ ভাবে অতীতের ভারতবাসী ছিলেন ইতিহাস বিমুখ। শুধু যে অতীত ইতিবৃত্তই এদেশে উপেক্ষিত হতো তা নয়, এই উদাসীনতার ফলে সমসাময়িক কালকেও অবজ্ঞা করা হযেছে। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে এমন গ্রন্থ দুর্ল্ভ যাতে লেখকের অব্যবহিত কালই উপজীব্য। চৈতন্যদেবের লোকোত্তর ব্যক্তিত্বের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে যখন ভক্তেরা তাঁর জীবনী রচনায় প্রবৃত্ত হন নিজেদের অজ্ঞাতসারে তাঁরা সমসাময়িক কালের প্রান্তদেশে পদক্ষেপ করেছিলেন।

চৈতন্যের জীবৎকালেই তাঁর জীবনী রচনা কার্য্য শুরু হয। তাঁর ভক্তবৃন্দের মধ্যে অনেকে কবি ছিলেন, এরা চৈতন্য বন্দনামূলক পদ লিখেছেন অনেক। কিন্তু বৃহৎ কাব্যের আকারে যেটি লেখা হয় সেটি সংস্কৃতে রচিত। এর রচয়িতা মুরারি গুপ্ত বাল্যে চৈতন্যদেবের সতীর্থ ও পরবর্ত্তীকালে বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ রূপে পরিচিত ছিলেন। চৈতন্যের অন্যতম অনুচর স্বরূপ দামোদরও একটি কড়চা লিখেছিলেন যা এখন আর পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালেও এই ধারা অনুসৃত হয়েছিল। কবিকর্ণপূর পরমানন্দ সেন চৈতন্য চরিত্র অবলম্বনে চৈতন্য-চরিতামৃত মহাকাব্য ও চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক লেখেন।

বাংলায় লিখিত প্রথম চৈতন্য জীবনীর নাম চৈতন্যভাগবত, এর রচয়িতা বৃন্দাবন দাস। শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর সন্তান বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের আদেশে চৈতন্যের তিরোধানের অল্পকাল পরে গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটিতে শুধু চৈতন্য নয়, নিত্যানন্দের জীবনেরও অনেক উপদান রয়েছে।

লোচনদাস তদীয় চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন তাঁর গুরু নরহরি সরকারের আদেশে। সহজ ভাষায় লিখিত এই গ্রন্থটি সাধারণ শ্রোতাদের খুব প্রিয়।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলও আটপৌরে ভাষায় লেখা। কিন্তু তথ্যগত বিভ্রান্তি ও কাব্যধর্মে ন্যূনতার ফলে এটি খুব বেশি নির্ভর যোগ্য নয়।

চৈতন্য জীবনীগুলির মধ্যে সর্ব্বাধিক পূজিত গ্রন্থ কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত চৈতন্যচরিতামৃত। বৃন্দাবনের ষট্ গোস্বামীর অন্যতম রঘুনাথ ভট্টের শিষ্য কৃষ্ণদাস অতি বৃদ্ধ বয়সে এই কাব্য রচনায় হাত দেন। কিন্তু যে-নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি কাব্যটি সমাপ্ত করেন তার তুলনা নেই। বিশেষতঃ চৈতন্যের শেষ জীবন আর কোনো গ্রন্থে এমন বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়নি।

এই চারটি কাব্যই ষোড়শ শতকে লিখিত। এদের সঙ্গে আর একটি কাব্যেরও নাম উল্লেখ করা হয়—গোবিন্দ দাসের কড়চা। কিন্তু এই কাব্যটির সত্যমূল্য সংশয়াবৃত। উপরোক্ত চারিটি কাব্যের মধ্যে কৃষ্ণদাসের কাব্য বৈষ্ণব তত্ত্বব্যাখ্যার দিক দিয়ে ও চৈতন্য জীবনের রূপায়ণে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হলেও সামাজিক ইতিহাসের উপাদান সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবতে। এক হিসাবে সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এই কাব্যটি দ্বিতীয় রহিত। চৈতন্যের বাল্য ও যৌবনের বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক পরিপার্শ্বের যে চিত্র এঁকেছেন তা স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। কৌতূহলোদ্দীপক এই বর্ণনার মধ্যে সেকালের বাংলাদেশ তার নানা বৈশিষ্ট্য নিয়ে এমনভাবে ধরা দিয়েছে যে শুধু এই গ্রন্থটি অবলম্বনে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সমাপ্ত হতে পারে।

জীবনী কাব্যগুলি ভক্ত কবিদের লেখা, অবলম্বিত বিষয় একজন মহাপুরুষের চরিত্র। সেইজন্য এই কাব্যগুলি অলৌকিকতার প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। এতে এদের বাস্তবতার লাঘব হয়েছে সন্দেহ নেই। তা সত্ত্বেও বালক ও গৃহী চৈতন্যের জীবন বর্ণনায় ও তাঁর পার্ষদগণের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখকেরা সমসাময়িক কালের অবস্থা বিষয়ে প্রচুর ইঙ্গিত দিয়েছেন।

শুধু চৈতন্য জীবনী নয়, প্রসঙ্গতঃ আরো কয়েকটি জীবনী কাব্যের উল্লেখ করা উচিত সামাজিক ইতিহাস রচনায় যাদের দান আছে। অদ্বৈত আচার্য্যের জীবনীসমূহের মধ্যে এগুলি উল্লেখযোগ্য :—

কৃষ্ণদাস (দিব্যসিংহ) রচিত বাল্যলীলাসূত্র, ঈশান নাগর রচিত অদ্বৈত প্রকাশ, শ্যামদাস আচার্য্য রচিত অদ্বৈত মঙ্গল, হরিচরণ দাস রচিত অদ্বৈত

মঙ্গল, নরহরি দাস রচিত অদ্বৈত বিলাস। অদ্বৈত আচার্য্যের পত্নী সীতাদেবীর জীবনীদ্বয়ও এদের সঙ্গে যুক্ত করা চলে—বিষ্ণুদাস আচার্য্যের সীতাগুণ কদম্ব ও লোকনাথ দাসের সীতাচরিত্র।

নিত্যানন্দের প্রভু বীরচন্দ্রের জীবনী রচনা করেন নিত্যানন্দদাস বীরচন্দ্র-চরিত নামে। বীরচন্দ্রেব অপর জীবনী গীতিগোবিন্দ প্রণীত বীর রত্নাবলী।

সপ্তদশ শতকের অন্যতম প্রধান ধর্ম্মনেতা শ্রীনিবাস আচার্য্যেরও কয়েকটি জীবনী পাওয়া যায়, যথা—নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস, গুরুচরণ দাসের প্রেমামৃত, যদুনন্দনের কর্ণানন্দ।

গোপী-বল্লভ দাসের রসিকমঙ্গলে শ্যামানন্দ-শিষ্য রসিকানন্দের জীবনকথা বিবৃত হযেছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইতিহাস ও মহাজনদের জীবনী মধ্যে সর্বপ্রধান গ্রন্থ অষ্টাদশ শতকে নরহরি (ওরফে ঘনশ্যাম চক্রবর্তী) বিরচিত ভক্তি রত্নাকর।

কিন্তু যেহেতু এসকল জীবনী গ্রন্থগুলির সবগুলি নির্ভযোগ্য নয় এবং তুলনায চৈতন্য চরিতাবলীর চাইতে নিকৃষ্ট সেজন্য বর্ত্তমান আলোচনায় চৈতন্য জীবনীগুলিই প্রধানতঃ আশ্রয করা হযেছে।

খ। কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য

কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যসমূহকে সচরাচব মঙ্গলকাব্যেব অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। কিন্তু মধ্যযুগের সমস্ত মঙ্গলকাব্যই দীর্ঘ রচনা যা সভাস্থলে আবৃত্তির যোগ্য। আখ্যাযিকামূলক ও বিবৃতিপূর্ণ কোনো কাব্য যা আবৃত্তির উপযোগী ছিল তাকেই নির্বিচারে মঙ্গল নামে অভিহিত করা হযেছে। এই অনুমান খুব অযৌক্তিক নয়। কৃষ্ণের কথা নিযে রচিত কাব্য এই কারণে কৃষ্ণমঙ্গল আখ্যা লাভ করে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রসঙ্গে পূর্ব্বে যেসব কথা বলা হযেছে, কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের স্বরূপ বোঝাবার জন্য তার কিছু কিছু অংশের পুনরুক্তি করা যাচ্ছে।

কৃষ্ণ সংক্রান্ত সমস্ত আখ্যায়িকার প্রধান দুটি রূপ আছে, একটি পৌরাণিক, অপরটি লৌকিক। বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, পদ্মপুবাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রভৃতি কাব্যে এবং বিশেষ ভাবে ভাগবতে কৃষ্ণ-লীলার এক জাতীয় রূপ লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্ত কাব্যে কৃষ্ণ গোপবালক, কিন্তু ঐশ্বরিক শক্তিতে পূর্ণ। তিনি পুতনা, অঘাসুর, কালিয় প্রভৃতিকে দমন, গোবর্দ্ধন ধারণ ও কংসের

বিনাশ সাধন করেন। বৃন্দাবনে তিনি গোপীনীদের সঙ্গে রাসলীলা করে অখিল ব্রজের চিত্তজয় করেছিলেন। তাঁর এই অলৌকিক শক্তির মহিমায় পুরাণ কথা পূর্ণ।

কিন্তু বাংলাদেশের লৌকিক উপকথায় কৃষ্ণের অন্যরূপ ধরা পড়ে। এখানে তিনি বীর নন। মুখ্যতঃ তিনি রাধার প্রণয়ী। কৃষ্ণের এই পরিচয়ে রতিভাবের অনেক সময় আতিশয্য ও অমার্জ্জিত রুচির ছাপ আছে। পুরাণ গুলিতেও অবশ্য রতিভাবের প্রাবল্য উপেক্ষণীয় নয়। প্রাচীনতর কাহিনী সমূহে কৃষ্ণের মূর্ত্তি বীর যোদ্ধার। কালক্রমে তাঁর প্রেমিক মূর্ত্তি·বীরমূর্ত্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশের উপাখ্যানে তাঁর এই পৌরাণিক রূপ ছাড়াও আর এক রূপ দেখা যায়। তিনি একান্তভাবে কেলিপরায়ণ, গোপীমণ্ডল মধ্যে বিরাজিত নায়করূপে চিত্রিত হয়েছেন।

বাংলা কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য সমূহে এই দুটি ধারা বিদ্যমান। এক ধারায় পুরাণ কথার প্রভাব, বিশেষতঃ ভাগবতের। অপর ধারায় পুরাণেতর আখ্যায়িকা, যেমন দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড প্রভৃতি। কোন কোন কৃষ্ণমঙ্গলকাব্য একান্তভাবে লৌকিক আখ্যায়িকায় পূর্ণ, যেমন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। কোন কোন কাব্যে ভাগবতের ছাপ প্রবল, যেমন রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিনী। আবার কোন কোন কাব্যে পুরাণের আবরণ রাখার চেষ্টা সত্ত্বেও লৌকিক ধারার গূঢ় প্রেরণা অনুভব করা যায়, যেমন ভবানন্দের হরিবংশ।

বাংলা কৃষ্ণমঙ্গলকাব্যের সংখ্যা কম নয়। এদের মধ্যে প্রধান রচনাগুলির নাম কালানুক্রমে দেওয়া যাচ্ছে :—

বড়ু চণ্ডী দাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, দ্বিজগোবিন্দের কৃষ্ণমঙ্গল, পরমানন্দগুপ্তের কৃষ্ণস্তবাবলী, রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিনী, মাধব আচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, বা ভাগবতসার, দৈবকীনন্দন সিংহের গোপালবিজয় পাঁচালী, দুঃখী শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গল, কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, 'শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর' কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণবিলাস, ভবানন্দের হরিবংশ, পরশুরাম চক্রবর্ত্তীর কৃষ্ণমঙ্গল, দ্বিজ জীবনের বিষ্ণুমঙ্গল, অভিরাম দাসের গোবিন্দবিজয়, দ্বিজ হরিদাসের মুকুন্দমঙ্গল, যশশ্চন্দ্রের গোবিন্দবিলাস, দ্বিজ বাণীকণ্ঠের শ্রীকৃষ্ণবিজয়, ভবানীদাস ঘোষের রাধাকৃষ্ণবিলাস, যদুনন্দন দাসের শুকদেব চরিত্র. দ্বিজ তিলকরামের গোবিন্দবিলাস, ঘনশ্যাম দাসের শ্রীকৃষ্ণবিলাস,

বলরাম দাসের কৃষ্ণলীলামৃত, দ্বিজ রমানাথের শ্রীকৃষ্ণবিজয়, গোপালসিংহদেবের রাধাকৃষ্ণমঙ্গল, শঙ্কর চক্রবর্ত্তী কবিচন্দ্রের গোবিন্দ মঙ্গল, পুরাণ দাসের রসমাধুরী প্রভৃতি।

এই তালিকায় কবিবল্লভ প্রণীত রসকদম্ব বইটিকেও ধরা কর্ত্তব্য। রসকদম্ব প্রধানতঃ তত্ত্ব নিবন্ধ হলেও এতে কৃষ্ণলীলার আখ্যান আছে।

গ। পদাবলী

বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ পদাবলী, অথচ বর্ত্তমান আলোচনার পক্ষে তার উপযোগিতা খুব বেশি নয়। পদাবলীর সংখ্যা অগণিত। শুধুমাত্র ক্ষণদা-গীত চিন্তামণি, পদামৃত সমুদ্র, গীতচন্দ্রোদয় ও পদকল্পতরু ধৃত পদের সংখ্যাই কয়েক হাজার। কিন্তু এ সমস্ত কবিতা থেকে সামাজিক ইতিহাসের উপাদান আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য। পদাবলী একান্তভাবে গীতধর্ম্মী। সেই গীতিরসাশ্রিত কাব্যে বাস্তব সংসারের প্রতিধ্বনি অতি ক্ষীণ। মুখ্যতঃ তা আত্মনিষ্ঠ ভাবনার বিষয় বলে তাতে বাস্তব জগতের সংবাদ শুধু পরোক্ষ উপায়ে অনুমিত হয় মাত্র। তবু, আলোচ্য নিবন্ধে দুয়েকটি পদের ব্যবহার করা হয়েছে।

ঘ। একটি অর্ব্বাচীন পুরাণ

উপরে যে সমস্ত গ্রন্থের উল্লেখ করা হলো সেগুলি সবই বাংলায় রচিত। এদের সঙ্গে একটি সংস্কৃত পুরাণেরও কিঞ্চিৎ সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ যে অন্যান্য পুরাণের তুলনায় অনেক পরবর্ত্তীকালের রচনা এবিষয়ে পণ্ডিতেরা প্রায় একমত। সম্ভবতঃ অষ্টম শতাব্দীতে এর প্রাথমিক কাঠামো নির্ম্মিত হয়। তারপর দশম থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বারংবার এর পরিমার্জ্জন ও সংযোজন চলতে থাকে (Studies in the Puranic records on Hindu rites & customs, P. 166 দ্রষ্টব্য)। এই পুরাণটি কেবল যে বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের সমসাময়িক তাই নয়, এর রচনাস্থলও যে বাংলাদেশ একথা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং বাংলার সামাজিক অবস্থা নির্ণয়ে এই পুরাণের সাক্ষ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্লেষণ রীতি

প্রশ্ন হতে পারে বৈষ্ণবধর্ম ও মতবাদ সম্পৃক্ত অথবা পুরাণকথা মূলক এই সমস্ত গ্রন্থ থেকে মধ্যযুগের সামাজিক জীবনের কতটুকু সংবাদ সংগ্রহ করা যায় এবং তা কতখানি নির্ভরযোগ্য ? এ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

যে-হিসাবে মানুষের সমস্ত মানস-সম্পদই বাস্তব সংসারের সঙ্গে স্রষ্টাহৃদয়ের সংযোগের ফল সে হিসাবে সমগ্র বৈষ্ণবসাহিত্য তথা বৈষ্ণবধর্মেরও একটি সামাজিক ভিত্তি আছে। কোনো কোনো লেখক মত প্রকাশ করেছিলেন যে, মধ্যযুগে বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক প্রসারের হেতু ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দুর অসহায়ত্ব বোধ। বাস্তব সংসারের পরাজয়কে আধ্যাত্মিক বৃন্দাবনের রসোল্লাসে গোপন করবার চেষ্টা আছে বৈষ্ণব ভাবাদর্শের মূলে। তাই রাধার আর্তিতে সে যুগের নির্জিত মানবাত্মার ক্রন্দন শুনতে পাওয়া যায়। একদেশদর্শী এই মত সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য না হলেও বৈষ্ণবধর্মের সামাজিক ভিত্তি অস্বীকার করা যায় না। অপর একজন লেখক অনুমান করেছেন যে, মুসলমান শাসন, শাক্ততান্ত্রিক মতবাদ ও নব্য ন্যায়ের অতিরিক্ত চর্চ্চা, এই তিনটি বস্তুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মনোভাব নিয়ে ভক্তিবাদী বৈষ্ণবধর্মের উত্থান ঘটেছিল। বস্তুতঃ মধ্যযুগের যে-পরিবেশে বৈষ্ণবধর্মের প্রসার ও চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটেছিল তার কথা স্মরণ রাখলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম যে বিশেষ একটি সামাজিক অবস্থার ফল তা সহজেই বোধগম্য হয়। সেই কারণে বৈষ্ণবধর্মাশ্রিত সাহিত্যের মধ্যেও কিছুটা সমাজচেতনা সূক্ষ্মভাবে মিশে থাকা স্বাভাবিক।

চৈতন্যজীবনীগুলির কথা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। এ সকল গ্রন্থ ষোড়শ শতকের একজন মহামানবের জীবনকথা ব'লে এতে মধ্যযুগের সামাজিক রূপটি খুব প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায়। জীবনীসমূহের মধ্যে অপ্রাকৃত কাহিনীর অভাব নেই সত্য, কিন্তু প্রাকৃত জগতের কাহিনী থেকে তাদের সহজেই পৃথক করে নেওয়া যায়। তবে চৈতন্য ব্যতিরিক্ত অন্যান্য ধর্মনেতার জীবনকাহিনীতে কিছু কিছু সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রবেশ করায় ও অতিরঞ্জন থাকায় এরা সর্বথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বাস্তবদর্শিতায় ও বিষয়নিষ্ঠায় চৈতন্যজীবনীসমূহ এদের চাইতে উন্নততর। চৈতন্যজীবনীগুলি কেবল যে তৎকালীন সমাজ সম্বন্ধে বহুবিধ সংবাদ পরিবেষণ করে তাই নয় এদের মানবিক আবেদনও তীব্র। যেখানে চৈতন্যের বাল্যের দুরন্তপণার পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে :

কেহ বোলে মোর পৃষ্ঠ দিয়া কান্ধে চড়ে
মুঞিরে মহেশ বলি ঝাঁপ দিয়া পড়ে। (চৈ-ভা, আদি।)

অথবা যেখানে চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের পর শচীদেবী পুত্রকে দেখে শোকার্ত হয়েছেন—

দোঁহার দর্শনে দোঁহে হইলা বিহ্বল
কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল।
অঙ্গ মুছে মুখ চুম্বে করে নিরীক্ষণ
দেখিতে না পায় অশ্রু ভরিল নয়ন। (চৈ-চ, মধ্য, ৩।)

সেখানে প্রাকৃত সংসারের রস স্বতোৎসাবিত হয়েছে। এই সমস্ত খণ্ড বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের মধ্যে সেই যুগের হৃৎস্পন্দন শোনা যায়।

কিন্তু চৈতন্যজীবনীগুলির ক্ষেত্রে যে কথা সত্য কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের ক্ষেত্রে তা সত্য নয়। কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে সমসাময়িক সমাজ-জীবনের প্রভাব নির্ণয় করা সহজ নয়। এই কাব্যসমূহ বহুলাংশে পুরাণাশ্রয়ী। পঞ্চম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে যেসব পুরাণ রচিত হয়েছিল তাদের ভাবানুবাদের মধ্যে মধ্যযুগের বাংলাদেশের চিত্র আবিষ্কার করবার চেষ্টা নিঃসন্দেহে পণ্ডশ্রম। তবু এদের মূল্য সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। তার কারণ—

প্রথমতঃ এই সকল কাব্য পুরাণের ওপর ভিত্তি করে রচিত হলেও কবিরা পুরাণের অন্ধ অনুবৃত্তি করেন নি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যে বৃন্দাবনের বর্ণনা আছে, কিন্তু সে বর্ণনা ভাগবতের বর্ণনার অনুরূপ নয়। কবি যে মনোরম উদ্যানের বর্ণনা দিয়েছেন এ কাব্যে তার বৃক্ষগুলি বাংলাদেশের। বৃন্দাবনের চেহারা হয়েছে পূর্বভারতের সুপরিচিত যে কোনো একটি বাগানের মতো। পাত্রপাত্রীর স্বভাবও অনুরূপভাবে বদলে গেছে কবিদের হাতে।

দ্বিতীয়তঃ সব কাব্যই ভাগবতের কিংবা হরিবংশের অনুকরণ নয়। পূর্বে বলা হয়েছে বাংলা দেশের নানা লৌকিক আখ্যায়িকা কালক্রমে কৃষ্ণকথায় সংযোজিত হচ্ছিল। এই সব আখ্যায়িকার মধ্যে সে-যুগের জীবনাদর্শের প্রভাব গভীর ভাবে অঙ্কিত রয়েছে। যেমন ধরা যাক শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের তাম্বুলখণ্ড। প্রণয়িনীর কাছে পুষ্প-তাম্বুল সহযোগে প্রণয় যাচ্ঞা পাঠানোর এই ভাগবত বহির্ভূত পদ্ধতিটি যে স্থানীয় কোনো একটি আচারের স্মারক তা'তে সন্দেহ নেই। তেমনি দানখণ্ডও সে যুগের দানীদের উপদ্রবের ওপর

ভিত্তি করে রচিত। বাস্তব সংঘটনাশ্রিত এই আখ্যায়িকাটিই পরবর্ত্তীকালে 'দানকেলি কৌমুদী'-র মতো গ্রন্থে পরিপূর্ণ আদর্শায়িত হওয়ার ফলে প্রাকৃত বিশ্বের সঙ্গে যোগ হারিয়েছে।

তবে একথা মানতে হবে যে, অধিকাংশ কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যেই বাস্তবতার সুদূরতম ছায়া নেই। এদের মধ্যে যে অল্পসংখ্যক কাব্যে লৌকিক উপাখ্যানের ধারাটি জয়যুক্ত হয়েছে শুধু তাদের থেকে সামাজিক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের আশা করা যায়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' সেইজন্য কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে বর্ত্তমান আলোচনার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী প্রতিপন্ন হয়েছে।

চৈতন্যজীবনী ও কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য থেকে অতীতকালের বাংলাদেশের যে চিত্র আমরা পাই তার পরিচয় দেওয়ার আগে দেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনৈতিক অবস্থা কি রকম ছিল সে বিষয়ে দুয়েকটি স্থূল কথা বলা দরকার।

সামাজিক রূপরেখা

পাঠান রাজত্বকালে সিংহাসনে যতই অস্থিরতা থাকুক দেশের শাসনযন্ত্রে মোটামুটি একটি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হোসেন শাহের আমলে দেশে সুশাসন স্থাপিত হওয়ায় জনসাধারণ উপকৃত হয়। ষোড়শ শতকের শেষভাগে দেশ মুঘল শক্তি কর্তৃক বিজিত হলে প্রথম কয়েক বছর নানারূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দিলেও শেষে সুনিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটে। মুঘল শাসনে দেশের শাসন ব্যবস্থার বিস্তৃত পরিচয় বাহারিস্তান, আইন-ই-আকবরি ও বিদেশী পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্তে পাওয়া যায়।

সমগ্র ভারতবর্ষ সে-যুগে কয়েকটি সুবায় বিভক্ত হয়। বাংলাদেশও ছিল সুবা। সুবার মুখ্যশাসক সুবাদার দিল্লীর বাদশাহ কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে তদীয় প্রতিনিধিরূপে কাজ করতেন। প্রতিদানে তিনি সম্রাটের কাছে বার্ষিক খাজনা পেশ করতেন। সুবাদার মুখ্যশাসক হলেও তাঁর একাধিপত্য ছিল না। সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত আরও ক'জন কর্মচারীর হাতে এমন কিছু ক্ষমতা ছিল যাতে সুবাদার কখনো সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে পারতেন না। দেশের অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতেন দেওয়ান, সামরিক ধনভাণ্ডারের নিয়ামক ছিলেন বকশী। তাছাড়া দিল্লীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করতেন ওয়াকি-নবিশ। ইনি রাজ্যের প্রাত্যহিক অবস্থা বিষয়ে নিরন্তর প্রতিবেদন পাঠাতেন

সম্রাটের কাছে। ফলতঃ সুবাদার এঁদের উপস্থিতির জন্য কখনো বিপথগামী হবার মতো সাহস সঞ্চয় করতে পারতেন না। সমস্ত সুবা আবার কতকগুলি সরকারে বিভক্ত ছিল এবং সরকারের মধ্যে ছিল অনেকগুলি পরগণা। সরকারের অধিকর্তার নাম ছিল ফৌজদার ও পরগণার অধিকর্তার নাম শিকদার। যখন রাজ্যের সংলগ্ন কোনো অংশ নূতন ভাবে জয় করা হতো সেখানে স্থাপন করা হতো থানা। থানায় সম্ভবতঃ কিছু সৈন্যদল একজন থানাদারের অধীনে রাখা হতো দেশে শান্তি স্থাপন ও উপদ্রব দমনের জন্য। থানাদারের চাইতে মনে হয় কিছুটা উন্নত পদ ছিল সর্দারের। এই সকল শাসনকর্তা ছাড়া আর ছিলেন ন্যায়াধীশ 'কাজি' ও আরক্ষাধ্যক্ষ 'কোতোয়াল'। প্রায় প্রত্যেক বৃহৎ জনপদে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য থাকতো কোতোয়ালি চবুতরা।

লক্ষ্যণীয় এই যে, শাসন পরিচালনার জন্য বৃহৎ কর্মচারী-সঙ্ঘ প্রতিপালিত হতো। তাদের প্রত্যেকের কর্তব্য ছিল সুনির্দিষ্ট, তেমনি তাদের কারো পক্ষেই একান্ত স্বেচ্ছাচারী হওয়া সম্ভব ছিল না। এমন অনেক তথ্য আছে যাতে প্রমাণিত হয় অন্যায় আচরণের জন্য বহু কর্মচারী বরখাস্ত কিংবা অন্যত্র বদলী হয়েছেন।

শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় শক্তির এই সতর্ক দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও সন্দেহ হয় দেশে অরাজকতা কিংবা উপদ্রব একেবারে কমে নি। পাঠান আমলে অনেক জমিদারই প্রতিপত্তিশীল ছিলেন। মুঘল আমলেও এঁদের বিশেষ শক্তি হ্রাস হয়নি। কোনো কোনো জমিদারের ভুসম্পদ বাজেয়াপ্ত হলেও সম্রাটের প্রতি আনুগত্য স্বীকারের পর আবার তার বহুলাংশ ফিরে পেয়েছিলেন জায়গীর রূপে। নিজেদের এলাকায় এঁরা ছিলেন প্রায় স্বৈরাচারী এবং তার ফলে প্রজাসাধারণের দুর্দশা কঠোর মুঘল শাসনেও উল্লেখযোগ্যরূপে কমে নি।

সাধারণ মানুষের অবস্থা যে সুখকর ছিল না তা রাজস্ব ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলেও বোঝা যায়। রাজস্ব আদায়ের প্রধান দুই পথ ছিল—ভূমির উপর ও বাৎসরিক পণ্য প্রভৃতির ওপর ধার্য কর। ভূমি ছিল মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত—সরকারের খাস জমি, জায়গীররূপে প্রাপ্ত জমি ও জমিদারের অধীন তালুক। খাস জমির তদারক করতেন হয় প্রত্যক্ষতঃ সরকার, না হয় বন্দোবস্ত নেওয়া মুস্তাজির। সরকার যখন নিজেই তদারককারী তখন তার ভার থাকতো ক্রোরী কিংবা ফৌজদারের ওপর।

রাজস্ব আদায়েব সুবিধার জন্য দেশকে চাকলা নামক বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল। রাজস্ব আদায়কারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ক্রোরীর সহকারী কারকুন ও কর-নির্ধারক কানুনগো। এঁদের সঙ্গে থাকতেন গাণনিকরূপে মুৎসুদ্দী। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, সম্ভবতঃ কবুলিয়ৎ রচনার সময়, চৌধুরী অর্থাৎ গ্রাম-প্রধানের সাহায্য প্রয়োজন হত। রাজস্ব আদায়কার্যে বিস্তৃত নথিপত্র রক্ষা করার ফলে সচরাচর এতে কোনো শিথিলতা দেখা যেত না। যাঁরা জায়গীর পেতেন তাঁরা খাজনা আদায় করতেন প্রায়শঃ নিজেদের কর্ম্মচারীদের দ্বারা। সৈন্যদল পোষণের জন্য কিংবা নৌবাহিনীর জন্যও জমি জায়গীর দেওয়া হতো যেমন পরবর্তীকালে ছিল পাইকান-জমি। এই রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা ক্রমেই জটিল হচ্ছিল এবং শেষের দিকে শিকদার, জায়গীরদারদের আমলা ও সরকারী কর্ম্মচারীদের উৎপীড়নে প্রজাদের দুরবস্থা বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারা সবচেয়ে উৎপীড়িত হতো জমিদারদের দ্বারা। নিজ নিজ এলাকায় রাজস্ব আদায়ের কার্যে জমিদারেরা ছিলেন প্রায় সর্বেসর্বা। বাদশাহের কাছে দেয় বার্ষিক খাজনা আদায়ের জন্য তাঁরা যেভাবে প্রজাদের ওপর অত্যাচার চালাতেন, বহু কাব্যে তার জ্বলন্ত বিবরণ পাই। তাছাড়া জায়গীরগুলিও বারবার হাতবদল হবার ফলে নূতন নূতন প্রভুর অত্যাচারে প্রজাদের দুঃখ সহনাতীত হয়ে উঠেছিল।

এই সমস্ত নির্যাতনের ওপরে ছিল অজস্র কর। পথে ভ্রমণকালে রাহদারি কর, পণ্য আমদানী কিংবা রপ্তানীতে মাশুল, দোকানের জন্য পণদারি এবং যে কোনো বণিক কিংবা ফেলিওয়ালাকে দিতে হতো 'হাসিল'। এমন কি নদীপথে যাত্রা করলেও নৌকাপ্রতি হাসিল দিতে হতো। এ ছাড়া ভ্রমণকারী, বণিক, অশ্ববিক্রেতা প্রভৃতিকে কর দিতে হতো 'জাকাত'—মোট আযের চল্লিশ ভাগের একভাগ। এই সমস্ত কর, বিশেষভাবে পথকর, মানুষের জীবন দুর্বহ করে তুলেছিল। সর্বোপরি ছিল ঘুষ। কোতোয়ালী চবুতরায় যেমন এর প্রয়োজন, বিচারালয়েও তেমনি। জমিদারও 'উপরি' আদায় করতেন। জমি বন্দোবস্ত নেওয়ার সময় দিতে হতো সেলামী, উৎসব উপলক্ষে ছিল পার্বনী এবং বাজারে হাটুরেদের কাছ থেকে তাঁরা নিতেন তোলা। এরূপ অসংখ্য উপদ্রবের ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে কতটুকু শান্তি অবশিষ্ট ছিল তা সহজেই অনুমেয় (দ্রষ্টব্য Bengal under Akbar and

Jahangir, Part I, Sec. I)।

মধ্যযুগের অপর কুপ্রথা হচ্ছে বেগার। সিপাহিদের ভয়ে লোকে কিভাবে সন্ত্রস্ত থাকতো বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে কবিদের আত্মপরিচয় প্রসঙ্গ (যেমন রামদাস আদক ও সীতারাম দাসের ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে) তার সাক্ষ্য দেয়। এর সঙ্গে উল্লেখ করা উচিৎ দাসপ্রথার। সমস্ত বাংলাদেশ জুড়ে দাস ক্রয় বিক্রয় চলতো। বিশেষতঃ ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের হাতে এই প্রথা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। দরিদ্রের পক্ষে জীবনের সামান্য নিরাপত্তাও কত দুর্লভ হয়ে উঠেছিল এতে তা বোঝা যায়।

অথচ বিস্ময়ের কথা দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি তখন ক্রমবর্ধমান। ইবন্ বতুতা যখন বাংলা দেশে এসেছিলেন দেশের দারিদ্র্য তাঁর চোখে ধরা পড়ে নি। শ্রীহট্ট থেকে পনেরোদিনে তিনি জলপথে সোনারগাঁ পৌঁছান। পথের পার্শ্ববর্তী জনপদ দেখে তাঁর মনে হয়েছিলো যেন শস্যসম্পদে উপ্‌চে পড়া বাজার দু'ধারে। বাংলাদেশে এসে বিদেশীরা বলতেন 'সুখের প্রাচুর্যপূর্ণ নরক বিশেষ'। আরো পরে চীনদেশীয় দূতের সহকারী মা হুয়ান লিখেছেন—এদেশে প্রচুর বস্ত্র উৎপাদিত হতো ও নানাস্থানে অসংখ্য ভোজনাগার ছিল।

বাংলার আর্থিক সম্পদ যে তখন উর্ধ্বাভিমুখী অন্যভাবেও তা জানা যায়। দেশের মুদ্রাব্যবস্থা থেকে তার আরেকটী প্রমাণ পাই। পাঠান আমল পর্যন্ত কড়িই ছিল সর্বাধিক ব্যবহৃত মুদ্রা। মুঘল আমলের গোড়ার দিকেও ছিল তাই। তখনও রাজস্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছিল শস্য। ক্রমশঃ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হলো, বিদেশী বণিকদের আগমন হতে লাগলো অধিক সংখ্যায়। ফলে রৌপ্যের আমদানী বেড়ে গেল। তখন থেকে দেশে রাজস্ব আদায় হয়েছে শস্যে নয়, মুদ্রায়। মা হুয়ান লিখেছেন—এদেশে তিনি কড়ির প্রাচুর্য দেখেছেন, অন্য মুদ্রা অল্পই ব্যবহৃত হতো। কিন্তু জাহাঙ্গীরের আমলেই রৌপ্যমুদ্রার চল বেড়ে যায় (দ্রষ্টব্য: History of Bengal, Vol II, P. 217)। এই বাণিজ্যস্ফীতি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়েছিল। সুদূর আরাকানে পর্যন্ত নানা দেশের লোকের ভিড় দেখি (আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে রোসাঙ্গ বর্ণনা পঠিতব্য)। কিন্তু এই বাণিজ্যের প্রসার ও ধনাগমের মধ্যেও সাধারণ মানুষের জীবন দুঃখকর ছিল। বৈষ্ণবধর্ম্মের একটি বড় গৌরব এই যে নিষ্পিষ্ট নিম্নশ্রেণীর মানুষের জন্য তা অনেকটা আশ্বাস ও শান্তি বহন

ক'রে এনেছিল।

অতঃপর দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ও আর্থিক ভাগ্যের এই সাধারণ পটভূমিকা স্মরণ রেখে চৈতন্যচরিত ও কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে সমাজের চিত্র কি ভাবে ধরা পড়েছে দেখা যেতে পারে।

শৈশব চিত্র

পারিবারিক জীবনে শিশুর আবির্ভাব একটি স্মরণীয় ঘটনা। বংশের অবিচ্ছিন্ন ধারাকে রক্ষা করার জন্য যে শিশুর জন্ম তাকে ঘিরে স্বভাবতঃই আনন্দ উৎসব বহুকাল থেকে হয়ে আসছে। প্রাচীন বঙ্গদেশে শিশুর জন্মের পর কি কি উৎসব হতো তার বাস্তব বর্ণনা পাওয়া যায় চৈতন্যচরিত গ্রন্থাদিতে। চৈতন্যের জন্মের পর একমাস পূর্ণ হলে প্রতিবেশী নারীরা 'বালক উত্থান পর্ব' অনুষ্ঠান করেছিলেন। শচীদেবীর সঙ্গে তাঁরা গঙ্গাস্নানে গমন করলেন,

বাদ্যগীত কোলাহলে করি গঙ্গাস্নান
আগে গঙ্গা পূজি তবে গেলা ষষ্ঠীস্থান।
যথাবিধি পূজি সব দেবের চরণ
আইলেন গৃহে পরিপূর্ণ নারীগণ।
খই কলা তৈল সিন্দুর গুয়া-পান
সভারে দিলেন আই করিয়া সম্মান। চৈ-ভা, আদি, ৩।

চৈতন্যদেবের অন্নপ্রাসন উৎসবেও বিস্তর আয়োজন হয়েছিল। লোচনদাস লিখেছেন—

এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় মাসে
নাম করণ হৈল অন্নপ্রাশন দিবসে।
পুত্র মহোৎসব করে মিশ্র পুরন্দর
অলঙ্কারে ভূষিত সোনার কলেবর।
অঙ্গদ কঙ্কন গলে গজমোতি হার
কটি স্বর্ণ-শিকলি মগরা পাত্র আর। চৈ-ম, লোচন, আদি।

নামকরণ উৎসবের রীতি কিরকম ছিল সে বিষয়ে বলা হয়েছে,—

সর্বশুভক্ষণ নামকরণ সময়ে
গীতা ভাগবত বেদ ব্রাহ্মণ পঢ়য়ে।

দেবগণে নরগণে করয়ে মঙ্গল
হরিধ্বনি শঙ্খঘণ্টা বাজয়ে সকল।
ধান্য পুথি খড়ি স্বর্ণ রজতাদি যত
ধরিতে আনিঞা করিলেন উপনীত।
জগন্নাথ বোলে বাপ শুন বিশ্বম্ভর
যাহা চিত্তে লয় তাহা ধরয়ে সত্বর। চৈ-ভা, আদি, ৩।

নবজাতকের ওপর প্রেতযোনির অপদৃষ্টি পড়তে পারে এই ভয় ছিল মানুষের মনে। চৈতন্যের জন্মের পরে তাঁকে রক্ষা করবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছিল,

যত আপ্তবর্গ আছে সব পরিকরে
অহনিশ সভে থাকি বালক আবরে।
বিষ্ণুরক্ষা কেহো কেহো দেবীরক্ষা পঢ়ে
মন্ত্র পঢ়ি ঘর কেহো চারিদিক বেঢ়ে। চৈ-ভা, আদি, ৩।

একদিন চৈতন্য দৈবকৃপায় সর্প দংশনের হাত থেকে রক্ষা পেলে

কেহো রক্ষা বান্ধে কেহো পঢ়ে স্বস্তি বাণী
কেহো অঙ্গে দেই বিষ্ণু পাদোদক আনি। ঐ, আদি,৩।

আর একদিন চৈতন্যের ওপর কোনো দেবতার ভর হয়েছে এই আশঙ্কায় শচীদেবী তাঁর অঙ্গে 'রক্ষা' বেঁধে দিলেন এই বলে

শির তোর রক্ষা করু চক্র সুদর্শন
চক্ষু নাসিকা মুখ রাখু নারায়ণ।
বক্ষ তোর রক্ষা করু দেব গদাধর
ভুজ তোর রক্ষা করু প্রভু রঘুবর।
উদর রক্ষণ তোর করু দামোদর
নাভিদেশ রক্ষা করু নৃসিংহ ঈশ্বর।
জানু দুই রক্ষা করু দেব ত্রিবিক্রম
রক্ষা করু ধরাধর তোর দু চরণ।
সব অঙ্গে থুথুকার দেই শচীমাতা
পুত্রভাবে অতিশয় হৈল উনমতা। চৈ-ম, লোচন।

শিশু আরেকটু বড় বড় হলে খেলাধূলায় প্রবৃত্ত হয়। বালক চৈতন্য শুধু

খেলাধূলায় আগ্রহী ছিলেন না, দুরন্তপনার জন্যও দুর্নাম অর্জন করেছিলেন। চৈতন্য চরিত গ্রন্থাদিতে তাঁর বাল্যক্রীড়ার যে বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায় তা বিশ্বস্ততায় ও সজীবতায় প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। অন্যান্য বালকের মতো চৈতন্যদেবও জীবজন্তু-প্রিয় ছিলেন। তিনি একদা একটি কুকুর শাবক পুষেছিলেন, কিন্তু তা শচীদেবার মনঃপূত হয়নি। একদিন চৈতন্যদেব বয়স্যদের সঙ্গে স্নানে গিয়ে যখন জলক্রীড়ায় মগ্ন—মাতল কুঞ্জর যেন—শচীদেবী কুকুরের বাচ্চাটিকে ছেড়ে দিলেন। কোনো বালক চৈতন্যকে এই খবর দিলে তিনি সত্বর গৃহে ফিরে এলেন।

চারি পানে চাহি	শ্বান শিশু নাহি	অন্তল ভরিল কোপে।
কান্দে উভ রাএ	পানি দেই মায়ে	শ্বানের শাবক শোকে।
শুন অবোধিনি	কি কৈলে জননী	এ দুঃখ দেয়লি মোরে
পরম সুন্দর	শ্বান শিশুবর	কেমনে দিলি কাহারে।
বলে শচীরাণী	আমি ত না জানি	শ্বানের শাবক তোর
এথানে আছিল	কেবা কতি নিল	কেমন বালক চোর। [ঐ]

চৈতন্য দুরন্ত ছিলেন। শচীদেবীর কাছে প্রায়শ প্রতিবেশিনীরা অভিযোগ করতেন—

বসন করয়ে চুরি বোলে বড় মন্দ
উত্তর কবিলে জল দেয করে দ্বন্দ্ব।
ব্রত করিবারে কত আনি ফুলফল
ছড়াইয়া ফেলে বল করিয়া সকল।
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেই অঙ্গে
যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে।
অলক্ষিতে আসি কর্ণে বোলে বড় বোল
কেহো বলে মোর মুখে দিলেক কুল্লোল।
ওকড়ার ফল দেয় কেশের ভিতরে
কেহো বোলে মোরে চাহে বিভা করিবারে।

চৈ-ভা, আদি, ৪।

চৈতন্যের দুরন্তপনার আরো উদাহরণ আছে,

কম্বলে ঢাকিয়া অঙ্গ দুই শিশু মিলি

বৃষপ্রায় হইয়া চলেন কুতূহলী।

যার বাড়ী কলাবন দেখি থাকে দিনে

রাত্রি হলে বৃষরূপে ভাঙ্গয়ে আপনে। চৈ-ভা, আদি, ৫।

গঙ্গার তীরে বালকবৃন্দ নিয়ে খেলা করার সময়ে চৈতন্য নিজেও অনেক খেলা উদ্‌ভাবন করতেন—

বালুকায় পক্ষ পদচিহ্ন অনুসরি

গমন করিল পক্ষ পদচিহ্ন ধরি।

ইহা বলি মহাপ্রভু চলে গৌরচন্দ্র

বালক সহিতে ক্রীড়া করিল নিবন্ধ।

এই পদচিহ্ন যেই বালক এড়ায়

সেই ততক্ষণে খেলা পরাজয় পায়।

যেই জনা তাহা যাঞা পারে ধরিবার

সেই জনা খেলা জিনে কান্ধে চড়ে তার।

তার কান্ধে চড়ি তার পিঠে মারে ছাট

কান্ধে করি লঞা যায় সঙ্কেত এই ঘাট।

ইহা বলি শিশু লই বালুকায় ধায়

মহা পরিশ্রমে ঘর্ম্ম নিকলয়ে গায়। চৈ-ম, লোচন।

পুত্রের এই খেলা দেখে জগন্নাথ ক্রুদ্ধ হলে নিমাই শচীর আঁচলে লুকিয়েছিলেন। চৈতন্য ভাগবতে 'কয়া' নামে আর এক ধরণের খেলার উল্লেখ আছে.

গৌড়দেশে জলকেলি আছে কয়া নামে

সেই জলক্রীড়া আরম্ভিলেন প্রথমে।

কয়া কয়া বলি করতালি দেন জলে

জলে বাদ্য বাজায়েন বৈষ্ণব মণ্ডলে। চৈ-ভা, অন্ত্য, ৯।

পদাবলীতেও মধ্যে মধ্যে কোনো কোনো খেলার বিবরণ পাই, যেমন বলরাম দাস লিখেছেন,

রাম কানু দুই ভাই দুই দিকে দাঁড়াইল

দুজনে সমান খেলু বাঁটিয়া লইল।

সুবল কানাইয়ের দিকে নাচিতে লাগিল

শ্রীদাম সুদাম তারা কানাইয়ের দিকে হইল।

সভাই সমান খেলু বাঁটিয়া লইল
হারিলে চড়িব কান্ধে এই পণ করিল।
আজুকার খেলাতে ভাই যেজন হারিবে
কান্ধে করি বংশীবটে রাখিয়া আসিবে।
সাতলি ভাঙিতে নারি ভেয়েরে কানাই
আপনি সাতলি ভাঙি জিতিল বলাই।

শিক্ষা

'বালকেহো ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে'—বৃন্দাবন দাসের এই উক্তিতে কিছুটা অতিরঞ্জন থাকলেও নবদ্বীপ যে বিদ্যাশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল সে যুগে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বৃন্দাবনদাস লিখেছেন—

নানাদেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়।
অতএব পড়ুয়ার নাহি নামুচ্চয়
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়। চৈ-ভা, আদি, ২।

এরূপ অধ্যাপক-ছাত্র সমাকীর্ণ নগরে সদ্‌বংশ জাত শিশু মাত্রেই বাল্যকাল থেকে বিদ্যাচর্চ্চায় ব্রতী হতো। বালক বিদ্যানুরাগী হলে পিতামাতা গৌরব বোধ করতেন। কিন্তু সে বিদ্যার সঙ্গে বিনয় যুক্ত না হলে তা দুঃখের কারণ হতো। একদিন জগন্নাথ মিশ্র জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপকে নিয়ে কোনো কার্যবশতঃ ভট্টাচার্য্য সভায় গিয়েছিলেন। বিশ্বরূপের সুন্দর মূর্তি দর্শনে সকলেই আনন্দিত হয়ে তাঁকে আদর করলেন।

এক ভট্টাচার্য্য বোলে কি পড় ছাওয়াল
বিশ্বরূপ বোলে কিছু কিছু সভাকার।

শিশুজ্ঞানে কেউ একথা শুনে তাঁকে তাড়ণা না করলেও মিশ্র পুত্রের অহঙ্কারে ব্যথিত হলেন।

নিজকার্য্য করি মিশ্র চলিলেন ঘর
পথে বিশ্বরূপেরে মারিলা এক চড়।
যে পুঁথি পড়িস বেটা তাহা না বলিয়া

কি বোল বলিলি তুই সভামাঝে গিয়া।
তোমারে ত সভার হইল মূর্খ জ্ঞান
আমারেও দিলা লাজ কহি অপ্রমাণ। চৈ-ভা,মধ্য,২২।

চৈতন্য ভাগবতে মধ্যখণ্ড-প্রথম অধ্যায়ে শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রদের সম্পর্কের সুন্দর চিত্র আছে। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সঙ্গে তদীয় ছাত্র চৈতন্যের সম্বন্ধ, আবার চৈতন্যের সঙ্গে তাঁর ছাত্রদের সম্বন্ধ বিষয়ে বর্ণনা পাই! গয়া থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পর নিমাই পণ্ডিত যা কিছু ব্যাখ্যা করেন 'শব্দ সনে বাখানেন কৃষ্ণ সমীহিত'। ছাত্রেরা বিদ্যা লাভ করতে এসেছে, ভক্তি লাভ করতে নয়। সুতরাং তারা দুঃখের সঙ্গে বিদায় নিল। চৈতন্য পড়ুয়াদের বললেন—

কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়
সবে দেখোঁ তাই সেই বোলোঁ সর্ব্বথায়।

অতঃপর—

এই বোল মহাপ্রভু সবারে কহিয়া
দিলেন পুঁথিতে ডোর অশ্রু-যুক্ত হৈয়া।

কিন্তু একালের মতো সেকালেও বিদ্যার অর্থকরী মহিমা স্বীকৃত হতো না। বিদ্যার্জ্জনের সঙ্গে আর্থিক সমৃদ্ধির নিশ্চিত সংযোগ না থাকায় পুঁথিগত বিদ্যার মূল্যে সংসারের অধিকাংশ লোকই আস্থাহীন ছিল। চৈতন্যের পড়াশোনা বন্ধ করে দিলে শচীদেবী দুঃখিত হয়ে বলেছিলেন—মূর্খেরে ত কন্যাও না দিবে কোন জনে। মিশ্র উত্তর দিলেন—

জগৎ পোষণ করে জগতের নাথ
পাণ্ডিত্য পোষযে কেবা কহিল তোমাত।
কিবা মূর্খ কি পণ্ডিত যাহার যেখানে
কন্যা লিখিয়াছে কৃষ্ণ সে হইব আপনে।
কুল বিদ্যা আদি উপলক্ষণ সকল
সভারে পোষয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ব্ববল।
সাক্ষাতেই এই কেনে না দেখ আমাত
পড়িয়াও আমার ঘরে কেনে নাহি ভাত।
ভালমতে বর্ণ উচ্চারিতেও যে নারে
সহস্র পণ্ডিত গিয়া দেখ তার দ্বারে।

অতএব বিদ্যা আদি না করে পোষণ

কৃষ্ণ সে সভারে করে পোষণ পালন। চৈ-ভা, আদি, ৫।

ধনবান মূর্খের প্রতি বিত্তহীন শিক্ষিতের অভিমান চিরকালই ছিল।

বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন

চৈতন্যদেবের বিবাহ প্রসঙ্গ থেকে সেকালের বিবাহ ব্যবস্থা কিরকম ছিল জানা যায়। মোটামুটি পিতামাতা বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করতেন। তবে স্বাধীন ভাবে পাত্র নির্ব্বাচন যে হতো না তা নয়। যেখানে অভিভাবকেরা সম্বন্ধ স্থির করতেন, জাতিকুলের কথা বিশেষ ভাবে বিবেচিত হতো এবং আর্থিক পদমর্য্যাদার কথা প্রকাশ্যে স্বীকৃত না হলেও কার্যত সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত সাক্ষীগোপালের আখ্যায়িকাটিতে তার ইঙ্গিত আছে। জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তীর্থ ভ্রমণ কালে এক যুবক ব্রাহ্মণের সেবা যত্নে প্রীত হয়ে তার হাতে কন্যা সম্প্রদানের সংকল্প করেছিলেন। যুবক তখন বলেছিল—

কাঁহা তুমি পণ্ডিত ধনী পরম কুলীন

কাঁহা মুঞি দরিদ্র মূর্খ তাতে কুলহীন।

পরে বৃদ্ধের পুত্রেরা বিবাহে আপত্তি জানালো। যুবককে বললো—

তীর্থযাত্রায় পিতার সঙ্গে ছিল বহু ধন

ধন দেখি দুষ্টের লইতে হইল মন।

আর কেহ সঙ্গে নাহি সবে এই একল

ধুতুরা খাওয়াইয়া বাপে করিল পাগল।

সবধন লঞা কহে চোরে লৈল ধন

কন্যা দিতে চাহিয়াছে উঠাইল বচন। চৈ-চ, মধ্য, ৫।

লোচনদাস চৈতন্যদেবের বিবাহের যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে সেকালের মধ্যবিত্ত পরিবারের বিবাহ-সভার রূপ অনুমান করা কঠিন নয়। অধিবাসের দিন বল্লভাচার্য্য

অন্য অন্য সৌরভ গন্ধ মাল্য চন্দন

অধিবাসে ভূষা কৈল জামাতা রতন।

অধিবাস সমাধান রজনীর শেষে
পানি সহিব বলি হইল উল্লাসে।

বিবাহের পূর্ব বল্লভ আচার্য ব্রাহ্মণ দ্বারা দেব পিতৃপূজা সমাধা করে আপন কন্যাকে নানা রত্ন অলঙ্কারে ও গন্ধ চন্দন মাল্যে ভূষিত করলেন।

শুভক্ষণ নিকট বুঝিয়া দ্বিজবর
ব্রাহ্মণ পাঠাঞা দিল আনিবারে বর।
এথা বিশ্বম্বর পহুঁ বয়স্তের সঙ্গে
অতি অদভূত বেশ করেন শ্রী অঙ্গে।

বল্লভ মিশ্র পদ্যে অর্ঘ্য দিয়ে ঘরে আনলেন বরকে—

তবে সেই মহাপ্রভু ছোড়লাতে গিয়া
দাণ্ডাইল পীঠোপরি উলসিত হৈয়া।

হেনমতে মহাপ্রভু ছোড়লাতে আছে
বর উরথিতে তথা আইহ গণ কাছে।
করিয়া বিচিত্র বেশ পরি দিব্যবাস
হাতেতে উজ্জ্বল দীপ অন্তরে উল্লাস।
আইহগণ আগে পাছে কন্যার জননী
বর উরথিতে ধনি চলিলা আপনি।
সাত প্রদক্ষিণ কৈল সাতদীপ হাতে
চরণে ঢালিল দধি হরষিত চিতে।

বরণ কার্য শেষ হতে হতে গোধূলি ঘনালো। তখন বল্লভ আচার্য্য কন্যা আনতে আদেশ দিলেন।

সর্ব্ব অঙ্গে অলঙ্কার রজত কাঞ্চনে
অন্ধকার দূরে যায় তাহার কিরণে।
প্রভু প্রদক্ষিণ করি ফিরে সাতবার
করজোড় করি শিরে করে নমস্কার।
অন্তঃপুট ঘুচাইল দোঁহে দোঁহা দেখি
দোঁহে দোঁহা দেখি দোঁহার না চলএ আঁখি।

চৈ-ম, লোচন, আদি।

চৈতন্যভাগবতে চৈতন্যের বিবাহ বর্ণনাও এর অনুরূপ। রাজ পণ্ডিত সনাতনের বাড়ির সম্মুখ ভাগ 'পূর্ণঘট ধান্য দধি দীপ আম্রসার' দিয়ে সাজানো হয়েছিল। আর

চতুর্দ্দিকে নানা বর্ণ উড়য়ে পতাকা
কদলক রোপি বান্ধিলেক আম্রশাখা।

বরযাত্রা এসে বাড়ির সামনে পৌছুলে

পরম সম্ভ্রমে রাজপণ্ডিত আসিয়া
দোলা হৈতে কোলে করি বসাইল নিয়া।

*   *   *

তবে বরণের সজ্জ সামগ্রী লইয়া
জামাতা বরিতে বিপ্র বসিলা আসিয়া।
পাদ্য অর্ঘ আচমনী বস্ত্র অলঙ্কার
যথাবিধি দিয়া কৈল বরণ ব্যভার।
তবে তান পত্নী নারীগণের সহিতে
মঙ্গল বিধান আসি লাগিলা করিতে।
ধান্য দূর্বা দিলেন প্রভুর শ্রীমস্তকে
আরতি করিয়া সপ্ত ঘৃতের প্রদীপে।
খই কড়ি ফেলি করিলেন উলুকার
এই মত যত কিছু করি লোকাচার।
তবে সর্ব অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া
লক্ষ্মীদেবী আনিলেন আসনে ধরিয়া।
তবে হর্ষে প্রভুর সকল আপ্ত গণে
প্রভুরেও তুলিলেন ধরিয়া আসনে।
তার মধ্যে অন্তঃপট ধরি লোকাচারে
সপ্ত প্রদক্ষিণ করাইলেন কন্যারে। চৈ-ভা, আদি, ১০।

চৈতন্য মঙ্গল ও চৈতন্য ভাগবতের এই বর্ণনার সঙ্গে ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণের নিম্নোদ্ধৃত অংশটির তুলনা করা যায়—

সপ্ত প্রদক্ষিণং কৃত্বা প্রণম্য স্বপতিং সতী।
শিষে চ শীততোয়েন স্নিগ্ধ-চন্দন-পল্লবৈঃ॥

তাং সিষে চ জগৎকান্তঃ কান্তাং শান্তাং চ সস্মিতাম্।
দদর্শ কান্তঃ কান্তাং চ কান্তং কান্তা শুভে ক্ষণে॥
অথ দেবী পিতুঃ ক্রোড়ে সমুবাস শুভাননা।
লজ্জয়া নম্র বদনা জ্বলন্তী চ স্বতেজ সা॥
রাজা দেবেশ্বরীং তস্মৈ পরিপূর্ণ তমায় চ।
প্রদদৌ সংপ্রদানেন বেদ মন্ত্রেণ নারদ॥
বসু দেবাজ্ঞয়া কৃষ্ণঃ স্বস্তীত্যুক্ত্বা স্থিতো মুদা।
জগ্রাহ দেবীং দেবশ্চ ভবানীং চ ভবো যথা॥
সুবর্ণানাং পঞ্চলক্ষং কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।
দক্ষিণাং তাং দদৌ রাজা পরিপূর্ণ তমায় চ॥

শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড।

কিন্তু সকল বিবাহ সুখের নয়, আর সব বিবাহের শেষেই প্রথম মাদকতা কেটে যাবার পর গ্লানি ও বিতৃষ্ণা দেখা দেয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই বিরাগ ও হতাশা বাড়তে থাকে। বিশেষ ভাবে সংসার জীবনে নানা অশান্তি জমা হয় যার মধ্যে একটি প্রধান জিনিস হলো শাশুড়ী-পুত্রবধূর সনাতন বিরোধ। ভবানন্দের 'হরিবংশে' আছে, রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের অবৈধ সম্পর্ক অনুমান করে রাধার শাশুড়ী অতিশয় কুপিত হয়েছিলেন। পুত্র 'আইমন' মধুপুর থেকে প্রত্যাবর্তন করলে তিনি তার কাছে অভিযোগ জানালেন।

আগুনে পুড়িছে মুখ হইছে বিকট
মাথা কাঁপাইয়া গেল পুত্রের নিকট।

*　　*　　*

কি বোলিমু আরে পুত্র মুখে নাইসে রাও
আমি কিছু নহি তোর রাধা তোর মাও।
ব্যর্থ কার্যে বিহা কৈলা বৃথ ভানুর ঝী
নাতি বধূ হৈল রাধা তুমি তার কী।
পুরীর ভিতরে পুত্র কেনে আইস আর
ভাগিনার বধূ না যুয়ায় দেখিবার।

*　　*　　*

পুত্র হৈয়া মোরে যদি না দেও সম্মান
তবে তোমার বধূ লৈয়া যাহ অন্য স্থান। পৃষ্ঠা ১০৩।

বিবাহোত্তর কালের এই তিক্ত অভিজ্ঞতা অধিকাংশ পুরুষের মনে ক্রমে ক্রমে উচ্চারিত কিংবা অনুচ্চারিত নারীবিদ্বেষে পরিণত হয়। ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণেও এজাতীয় নারী বিদ্বেষের নিদর্শন আছে কোথাও কোথাও। নারীকে বলা হয়েছে হৃদয়হীন ও কাম পরবশ (ব্রহ্মা ও মোহিনীর উপাখ্যান এর উদাহরণ)। কাম ও আহার প্রবণতা তাদের লক্ষণীয় গুণ। তারা এত মমতা শূন্য যে—

রোগিণং নির্ধনং বৃদ্ধং যোষিদ্বৈ প্রেক্ষতে প্রিয়ম।

লোকাচার—ভয়াত্তস্মৈ দদাত্যাহার মল্পকম্॥ ব্রহ্ম খণ্ড, ২৩।

কবিবল্লভ বিরচিত রসকদম্ব কাব্যে পুরুষের বিবাহ ও বিবাহোত্তর জীবনের দুঃখময় অভিজ্ঞতার একটি কৌতুকোদ্দীপক বর্ণনা পাই। অংশটি দীর্ঘ হলেও উদ্ধরণযোগ্য। চতুর্থ অধ্যায় 'হাস্যরসে' কৃষ্ণ রুক্মিণীকে বলছেন, পুরুষেরা প্রথম যৌবনে বিবাহের জন্য আগ্রহী হয়—

অহর্নিশ মনঃ কথা বিভার কারণে
নানা দুঃখে অর্থ সঞ্চয় করে দিনে দিনে।
সর্ব্ব কার্য্য ছাড়িয়া বিবাহ করে আগে
গৃহপুর পরিষ্কার করে অনুরাগে।

কিন্তু বালিকা বধূ সহজে বশ্যতা স্বীকার করেনা।

নবীন রমণীগণ নাহি জানে রস
ক্ষণমাত্রে কোন যোগে নহে পতিবশ।
সর্ব সঙ্গে হাসে খেলে থাকে নানা সুখে
স্বামীকে দেখিলে মাত্র রহে অধোমুখে।
কন্দল পীরিতি কথা সব সঙ্গে কহে
পতি কিছু জিজ্ঞাসিলে মৌন হৈয়া রহে।

এতে পুরুষের তৃষ্ণা মেটে না।

সহজে পুরুষ নব নারীর কারণে
দেখিতে শুনিতে বাঞ্ছা করে ক্ষণে ক্ষণে।
গৃহ মধ্যে থাকে (পত্নী) ধৈর্য্য কথা কহে
কোন ছলে তার পতি আঙ্গিনাতে রহে।
দেখিতে না পায় তবু চাহে চারিদিকে
না শুনে বচন তভু কর্ণপাতি থাকে।

(ব্যাজ লক্ষ কার) সঙ্গে দীর্ঘ কথা কহে
কারণে রহিত তভু নানা ছলে রহে।
বৃদ্ধা দাসী শিশু দাস পত্নী সঙ্গে থাকে
যত্ন করি তার কথা পুছে তা সভাকে।
যথা তথা ভাল দ্রব্য পায় কোন মতে
আপনে না (ভোগে) দেয় তার সখীর হাতে।
সখী যদি পতি দ্রব্য হেন তাকে কহে
হস্তে হোঁ না ছোয় তাহা নয়ানে না চাহে।
মিষ্ট দ্রব্য তিক্ত মানে কণ্টক কুসুমে
অন্য স্থলে চলে সখী বচন না মানে।
সুখে স্বামী নানা বেশ রচিয়া আপনে
যেথানে দেখিতে পায রহে সেইখানে।
দৈবযোগে পতি যদি দেখে সেই নারী
নয়ান পুতলি ঢাকে বিষ সম করি।

বজনীতে পুরুষ স্ত্রীব জন্য অপেক্ষা করে থাকে, অথচ স্ত্রী আসতে অনিচ্ছুক।

তার নাবী প্রবোধিঞা আনে দাসীগণ
শয্যাতে বসিযা করে বিমুখে শযন।
নিজভুজে শির তার হৃদয় বিলাস
জাগিতে হোঁ নিদ্রাছলে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
পতি যদি পত্নী অঙ্গে নিজ (কর) ঢালে
তার কর ধরি তবে তৃণবৎ ফেলে।

* * *

ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে কখন শযন
অল্পমাত্র নিদ্রা সর্ব্বরাত্রি জাগরণ।

কিন্তু চিরকাল এরূপ থাকে না, বালিকা বড় হয়, ধীরে ধীরে জগতের চেহারা বদলায় তার কাছে।

এই দুঃখে চিরদিন করে নানা রীতি
কাল পাঞা নানা যোগে জথায় সুরতি।
যৌবন অঙ্কুর দেখি নায়ক সকলে

রতিরস সকল শিখায় তার তরে।
বক্রকথা হাস্যগতি লোচন ইঙ্গিত
পতিতে শিখিঞা হয় আপনি পণ্ডিত।
জানিলে অধিক তার শতগুণ রচে
পাছে সেই পতি তার মরম না বুঝে।
এক কহে আর (করে) আর থাকে মনে
নায়কের চিত্তে শঙ্কা বাঢ়ে দিনে দিনে।
তবে পতিব্রতাধর্ম্ম শিখায় তাহাঁকে
হৃদয়ে হৃদয়ে থাকে রসে রতি সুখে।
(গোপ্ত) রূপে গৃহে করে বিরল সন্ধান
আপ্তগণ স্থানে করে নিত্য (সাবধান)।
মনে মনে চিন্তে তবে অপত্য সঞ্চয়
অপত্যে অধিক তার যৌবনের ক্ষয়॥
অপত্যে জন্মিলে হয় স্বতন্ত্র গৃহিনী
অহঙ্কারে নিত্যরূপে বোলে কটুবাণী।
শিশু হেতু স্নেহ করে পতিকে নিরাস
যত ইংসা কবে তাহা স্বতন্ত্র বিলাস।
তার পতি নিত্য ধন উপার্জ্জন করে
নানা সুখে যুবতী পালিঞা থাকে ঘরে।
বৃদ্ধ হৈলে পতি তার হয় অভাজন
নিরবধি সহে পত্নী পুত্রের তর্জ্জন।

এরপর আসে সবচেয়ে দুঃসহ অবস্থা—বার্ধক্য।

পত্নীপুত্রে বোলে বৃদ্ধ জীয়ে অকারণ
সকলে বাঞ্ছয়ে সদা বৃদ্ধের মরণ।
অসুস্থ অবল দেখি সভে মন্দ বোলে
না মরে কারণ (সভে নিত্য তিরস্করে)।
সুন্নীতে না হয় তার ভক্ষণ শয়ন
মরণ অধিক দুঃখ বৃদ্ধের জীবন।
বৃদ্ধ মৈলে তার নারী বোলে পুত্রস্থানে

অল্পব্যয়ে তার কর্ম্ম কর সমাধানে।
যে মৈল তাহার হেতু ছাড় উপবাস
ক্রন্দন অসুখ না করিহ ধননাশ।
পুত্রগণ কর্ম্ম করে মায়ের বচনে
তা সভার এই গতি হয় কালক্রমে।

এই চিত্রে কিছু সত্য থাকলেও তা সম্পূর্ণ সত্য নয় নিশ্চয়ই। নারীরূপে মোহকারিতা, যৌবনের অসার দম্ভ ও বার্ধক্যের বিড়ম্বনা বিষয়ে এরকম উক্তি সবকালেই শোনা যায়। প্রায় একই রকম কথা রয়েছে দৌলৎকাজীর লোর-চন্দ্রানীতে।

বৃদ্ধের মরণে হয় যুবকের আশ
হেমন্ত অন্তরে যেন বসন্ত উল্লাস।
কপট সংসার মায়া বুঝিতে না পারি
পিতৃকে মারিয়া পুত্র রাজ্য অধিকারী।
চারিযুগ বৃদ্ধ সতী যুবতী আকার
প্রতিদিন এক স্বামী করয় সংহার।
তাহাকে গ্রাসিয়া পুনি আন স্বামী বরে
পাপিনী খাকিনী কাকে দয়া নাহি করে।
দারুণ পৃথিবী এই ব্যবস্থা তাহার
এক যায় আন আইসে কেহ নহে সার।

আহার্য্য

চৈতন্য চরিতামৃতে মহাপ্রভুর আহার প্রসঙ্গে সেকালের আহার্য তালিকা দেওয়া হয়েছে। রায়শেখরের একটি পদ থেকে তার অনুরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া যাচ্ছে।

কর্পূর মালতী   করল যুবতী
মনোলোভা মনোহরা
কণ্ডলা কদম্বা   রেউড়ি পদ্মমা
মতিচুর সুমধুরা।

অমৃত কেলিকা　　　বিবিধ লড্ডুকা
　　চাকিখণ্ড পদ্মচিনি
গুজা থাজা পেড়া　　　চানা চন্দ্রচূড়া
　　মিছিরি মারিষা ফেনি !
লুচি পুরি করি　　　রসপাকে ভরি
　　সরভাজা সরপুরি
মাটিরি সাকরা　　　রসপুর ঝুরা
　　যতন করিয়া করি।
সুগন্ধি শীতল　　　করিয়া নিমল
　　ভরিয়া সোনার থালী
ভোজন ভবনে　　　রাখিল যতনে
　　ঢাকিয়া নেতের ফালি।

গত কয়েক শতাব্দীতে বাঙালীর আহার তালিকায় বিস্তর পরিবর্ত্তন হয়েছে সন্দেহ নেই।

কর্ম্ম ও বৃত্তি

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে (ব্রহ্ম খণ্ড, ১০ অধ্যায়ে) বিভিন্ন বৃত্তির বিবরণ রয়েছে। বিশ্বকর্ম্মা ও ঘৃতাচীর নয়টি সন্তান, তারা শিল্পকার্যে দক্ষ। এদের নাম— শঙ্খকার, মালাকার, কর্মকার, কাংস্যকার, কুম্ভকার, সূত্রধর, তন্তুবায, স্বর্ণকার, চিত্রকর। এ থেকে সে যুগে নিম্নবর্ণভুক্ত বাঙালী কোন্ কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করতেন জানা যায়। এ ছাড়া আরো অজস্র বৃত্তি সমাজে চলতি ছিল, বিশেষ করে অন্ত্যজ শ্রেণীতে। চৈতন্য জীবনী গ্রন্থে যে দুয়েকটি বিচিত্র বৃত্তির কথা পাওয়া যায় তাদের উল্লেখ করছি।

শিখি মাহিতীকে বলা হয়েছে লিখন-অধিকারী (চৈ-চ, মধ্য, ১০)। এই পদের অধিকারী ছিলেন জগন্নাথদেবের মন্দিরে হিসাব রক্ষক। গণনা কার্য বা হিসাব রাখা এগুলি ছিল মুখ্যত কায়স্থের কর্ম। অনুতপ্ত জগাই মাধাই মহাপ্রভুকে বলেছিল

　　সহস্র কায়স্থ যদি দুই মাস গণে
　　তভু আম্মা দোঁহা পাপ গণিতে না জানে। চৈ-ম,লোচন।

গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুত করাও বৃত্তির মধ্যে গণ্য হতো। এ কার্যে রত ব্যক্তিদের নাম ছিল আখরিয়া।

ঠাকুরের এক শিষ্য শ্রীবিজয় দাস
সে মহাপুরুষ কিছু দেখিলা প্রকাশ।
নবদ্বীপে তেন মত নাহি আখরিয়া
প্রভুকে অনেক পুঁথি দিয়াছে লিখিয়া।

মহাপ্রভু প্রীত হয়ে বিজয়দাসকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'রত্নবাহু' (চৈ-ভা,অন্ত্য,৯)।

নৃত্য-গীত-অভিনয়

মধ্যযুগে বাংলা দেশে সঙ্গীত নাটক প্রভৃতির ব্যাপক প্রচলন ছিল। মঙ্গল গান—পাঁচালী—নাটগীত, এদের মধ্যে কোন্‌টি সর্ব্বপ্রাচীন বলা দুষ্কর। তবে চর্য্যাগীতিতে উল্লেখিত,

নাচন্তি বাজিল গাঅন্তি দেঈ
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই।

এই উক্তি থেকে অনুমান করা কঠিন নয় গীত সহযোগে নৃত্য বহুকাল থেকে এদেশে জনপ্রিয়।

মঙ্গল শব্দটি অতি প্রাচীন। অশোকের অনুশাসনে এর কথা পাওয়া যায়। হরিবংশ, হর্ষচরিত প্রভৃতি গ্রন্থেও মঙ্গলগানের উল্লেখ আছে এবং জয়দেব তাঁর কাব্যের পরিচয় দিয়েছেন 'মঙ্গল-উজ্জ্বল-গীতি'। এটি যে বিশেষ এক ধরণের সঙ্গীত তা বোঝা যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও মঙ্গল শব্দের এরূপ প্রয়োগ দেখে (পৃঃ ৫৭)। এ ছাড়াও বাংলা সাহিত্যে এই অর্থে মঙ্গল শব্দটি বহুবার পাওয়া গেছে।

ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্ব থেকেই বাংলা দেশে যাত্রার চল ছিল এবং অন্তত ষোড়শ শতাব্দী থেকে কৃষ্ণযাত্রার প্রসার ঘটে। বৃন্দাবনদাস লিখেছেন,

কৃষ্ণযাত্রা অহোরাত্র কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
ইহার উদ্দেশ নাহি জানে কোন জন। চৈ-ভা, আদি,৬।

যাত্রায় সাজসজ্জার ব্যবস্থা থাকতো। একে বলা হতো 'কাচ' কাচা, যেমন—'কোনো শিশু নারদ কাচয়ে দাড়ি দিয়া' অথবা 'হনূমান কাচে শিশু চলিলা তখন' (চৈ-ভা, আদি, ৬)। চৈতন্য ভাগবতে অভিনয় বিষয়ে বহু বর্ণনা

আছে। এক স্থানে কবি লিখেছেন,

পূর্ব্বে দশরথ ভাবে এক নটবর
রাম বনবাসে এড়িলেন কলেবর।

কিন্তু সবচেয়ে মনোজ্ঞ বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে মহাপ্রভুর অভিনয় বিষয়ে (চৈ-ভা, মধ্য, ১৮)।

একদিন প্রভু বলিলেন সভাস্থানে
আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বিধানে।
সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া
বলিলেন প্রভু কাচ সজ্জ কর গিয়া।
শঙ্খ কাঁচুলী পাটশাড়ী অলঙ্কার
যোগ্য যোগ্য করি সজ্জ কর সভাকার।
গদাধর কাচিবেন রুক্মিণীর কাচ
ব্রহ্মানন্দ তার বুড়ী সখী সুপ্রভাত!
নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার
কোতোয়াল হরিদাস জাগাইতে ভার।

* * *

প্রথমে প্রবিষ্ট হইলা প্রভু হরিদাস
মহা-দুই গোফ করি বদন বিলাস।
মহাপাগ শোভে শিরে ধটী পরিধান
দণ্ড হস্তে সভারে করয়ে সাবধান।

* * *

ক্ষণেকে নারদ কাচ করিয়া শ্রীবাস
প্রবেশিলা সভামাঝে করিয়া উল্লাস।
মহাদীর্ঘ পাকাদাড়ি ফোঁটা সর্ব্বগায়
বীণা কান্ধে কুশ হস্তে চারিদিকে চায়।
রামাঞি পণ্ডিত কক্ষে করিয়া আসন
হাতে কমণ্ডলু পাছে করিলা গমন।

* * *

প্রথম প্রহরে এই কৌতুক বিশেষ
দ্বিতীয় প্রহরে গদাধরের প্রবেশ।

সুপ্রভাত তান সখী করি নিজ সঙ্গে
ব্রহ্মানন্দ তাহার বড়াই বুলে রঙ্গে।
হাতে নড়ি কাঁখে ডালি নেত পরিধান
ব্রহ্মানন্দ যেহেন বড়াই বিদ্যমান।
ডাকি বোলে হরিদাস কে সব তোমরা
ব্রহ্মানন্দ বোলে যাই মথুরা আমরা।

০ ০ ০

রমা বোল গদাধর নাচে মনোহর
সময় উচিত গীত গায় অনুচর।

ইতিমধ্যে মহাপ্রভু প্রবেশ করলেন 'আদ্যাশক্তি বেশধর'। কিন্তু অভিনয় বেশিদূর অগ্রসর হতে পারলো না। অভিনেতৃবৃন্দ 'কৃষ্ণরসে বিহ্বল' হলেন, শ্রোতারাও ভাবাবেশে 'কেহ পড়ে লক্ষ্মী স্তব কেহ চণ্ডী স্তুতি'। এই ভাবে রাত্রি পোহালো।

যাত্রার মতো মঙ্গল গানের জনপ্রিয়তাও অবিসংবাদিত। মদোন্মত্ত জগাই-মাধাই সংকীর্ত্তন শুনে উপদেশ দিয়েছিল—

প্রভুরে দেখিয়া বোলে নিমাঞি পণ্ডিত
করাইল সম্পূর্ণ মঙ্গলচণ্ডী গীত।
গায়েন সব ভাল মুঞি দেখিবারে চাও
সকল আনিয়া দিব যথা যেই পাও। চৈ-ভা, মধ্য, ১৩।

দান-নৌকা লীলা যে সে যুগে বহুল প্রচলিত ছিল তা বুঝতে পারি নিত্যানন্দ প্রভুর দান খণ্ড অভিনয় প্রীতি থেকে।

দান খণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ
শুনি অবধূত সিংহ পরম সন্তোষ। চৈ-ভা, অন্ত্য, ৫।

পাচালী কিংবা পাঞ্চালিকা যদি মলতঃ পুতুলনাচ হয়ে থাকে তাহলে বলতে হয় এটিও মধ্যযুগে আনন্দ সম্ভোগের উপকরণ রূপে সুপরিচিত ছিল। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন 'কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়'। কৃষ্ণদাস কবিরাজও এই উপমাটি ঘন ঘন প্রযোগ করেছেন।

চৈতন্যের জন্মের পূর্বেই পেশাদার বাদকেরা 'নট' নামে স্বতন্ত্র একটি শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিলেন। পুত্রবধূকে বরণ করবার পর শচী দেবী—

বিপ্র আদি যত জাতি নট বাজনিঞা
সভারে তুষিলেন ধন বস্ত্র বাক্য দিয়া। চৈ-ভা, আদি, ৭।

গৃহে উৎসব উপলক্ষে নটদের আমন্ত্রণ করা হতো।

স্ত্রীগণেতে জয় দিয়া কৃষ্ণ গুণ গায়
নটগণে মৃদঙ্গ সানাঞি বংশী বায়। চৈ-ভা, আদি, ৬।

এবং

নৃত্যগীত নানা বাদ্য বায় নটগণে। ঐ, আদি, ৭।

বাড়ি বাড়ি গিয়ে গান করতো নানা জাতীয় লোক। হরিদাসের প্রসঙ্গে এরকম একটি বর্ণনা পাই—

একদিন এক বড় লোকের মন্দিরে
সর্পক্ষত ডঙ্ক নাচে বিভিন্ন প্রকারে।
মৃদঙ্গ মন্দিরা গীত তার মন্ত্র ঘোরে
ডঙ্ক বেঢ়ি সভেই গায়েন উচ্চস্বরে।
দৈবগতি তথায় আইলা হরিদাস
ডঙ্ক নৃত্য দেখেন হইয়া এক পাশ।
মনুষ্য শরীরে নাগরাজ মন্ত্র বলে
অধিষ্ঠান হইয়া নাচয়ে কুতূহলে।
কালিদহে করিলেন যে নাট্য ঈশ্বরে
সেই গীত গায়েন কারুণ্য উচ্চস্বরে।

'ডঙ্ক' শব্দের ব্যাখ্যা করে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন বলেছেন 'ডঙ্ক শব্দের এই অর্থ ছিল সাপের রোজা, তার থেকে অর্থ হলো গুণী বা হুনুর ব্যক্তি, যাঁর অনেকটা লৌকিক অভিজ্ঞতা ও খানিকটা অলৌকিক বিদ্যা আছে।' (বিচিত্র সাহিত্য, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭)।

শিব সংকীর্ত্তনও জনপ্রিয় ছিল বলে মনে হয়।

আর দিন শিবভক্ত শিব গীত গায়
প্রভুর অঙ্গনে নাচে ডম্বরু বাজায়।
মহেশ আবেশ হৈলা শচীর নন্দন
তার স্কন্ধে চড়ি নৃত্য কৈল বহুক্ষণ। চৈ-চ আদি, ১৭।

উৎসবাদিতে সে যুগে কি কি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হতো লোচনদাস তার

সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়েছেন চৈতন্য মঙ্গলের আদি খণ্ডে—

শঙ্খ দুন্দুভি বাজে ডেউর কাহাল
মৃদঙ্গ পড়াহ বাজে কাংস্য করতাল।
ঢাকের ডুড়ডুড়ি শুনি যোজনেক পথে
শুনিয়া জুড়ায় হিয়া সাহীনি শবদে।
বীণা বেণু কবিলাস রবাব উপাঙ্গ
মেলিয়া বাজায়ে পাখোযাজ এক সঙ্গে।

[চৈতন্য চরিতামৃতের একস্থানে বলা হয়েছে—

প্রাতে চলি আইলা কানাইর নাট্যশালা
দেখিল সকলে তাঁহা কৃষ্ণ চরিত্রলীলা। মধ্য, ১।

সেকালে কি স্থায়ী নাট্যশালা ছিল, নাকি এটি কোনো মূর্ত্তি প্রদর্শনীর প্রতি ইঙ্গিত ?]

ধর্ম্ম

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব পূর্ব্ববর্ত্তীকালে ধর্ম্মের মহিমা ম্লান হয়ে এসেছিল। বিভিন্ন জীবনী কাব্যে নবদ্বীপের যে চিত্র রয়েছে তাতে একে ধর্ম্মহীন নাস্তিকের বিলাস সম্ভোগের পীঠস্থান বলে মনে হয়। বৃন্দাবন দাস নবদ্বীপে অবৈষ্ণব ব্যক্তিদের প্রাধান্য ও তাদের অবলম্বিত, ধর্মের গ্লানি বিষয়ে অনেক আতিশয্য-পূর্ণ কটূক্তি করেছেন, কিন্তু এর মূলে কিছু সত্য ছিল নিঃসন্দেহে। নবদ্বীপ তখন বিরাট সহর, এর 'একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে' (চৈ-ভা, আদি, ১) এবং বিদ্যা চর্চ্চার জন্যেও এর খ্যাতি ছিল—'সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সভে মহা দক্ষ'। শুধু বিদ্যা নয়, ধনের প্রাচুর্য্যও ছিল। কিন্তু বৃন্দাবনদাস বলেছেন ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন হওয়াব ফলে এই সমৃদ্ধি নিস্ফল প্রতিপন্ন হয়েছিল।

রমা দৃষ্টিপাতে সর্বলোক সুখে বসে
ব্যর্থকাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণ নাম ভক্তি শূন্য সকল সংসার
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার।
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সভে এই মাত্র জানে
মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।

দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহুধনে।
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়ে
এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায়ে। চৈ-ভা, আদি, ২।

আরো বলেছেন—

বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে। [ঐ]

স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় সেকালে অপৌরাণিক নানা দেবতার পূজা নিম্নশ্রেণীভুক্ত নরনারীর মধ্য থেকে উদ্ভূত হয়ে উচ্চতর বর্ণে প্রবেশ লাভ করেছিল। বাশুলীর পূজা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কেননা কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যধারায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাসও নিজেকে বাসলীর সেবক বলেছেন। বাশুলী বা বাসলী বাগীশ্বরী কিংবা বিশালাক্ষী নন। নামটির মূলে ছিল একটি প্রাচীন হিন্দ্-আর্য্য বর্গীয় শব্দ 'বাস্তবা' যার অর্থ রাত্রি। দুর্গার অপর নাম কালরাত্রি। বাসলী ছিলেন দুর্গারই রূপভেদ 'রাত্রির কিংবা অন্ধকারের দেবী' (দ্রষ্টব্য Indian Linguistics, Jules Bloch memorial no এ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের প্রবন্ধ)। সুতরাং প্রাচীন বঙ্গদেশে শাক্ত-তান্ত্রিকতার প্রসার যে ব্যাপক ছিল তা নিঃসংশয়ে অনুমান করা চলে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মধ্যেও তান্ত্রিক প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। তন্ত্রের প্রভাব হিতকর কি অহিতকর সে-বিচার স্থগিত রেখে বলা চলে সেকালের বৈষ্ণব সমাজ এই প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণকে বড়ায়ি উপদেশ দিয়েছে—

স্তম্ভন মোহন আর দহন শোষণে
উচ্চাটন বাণে লঅ রাধার পরাণে। পৃঃ ১০৫।

তৎকালীন সমাজে এরকম অভিচার-ক্রিয়ার প্রতি আসক্তি ছিল বহুধাব্যাপ্ত। যোগক্রিয়াও প্রকৃতপক্ষে তান্ত্রিক আচারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল। কৃষ্ণ স্বয়ং একস্থানে বলেছেন—

অহোনিশি যোগ ধেআই
মন পবন গগনে রহাই।

মূলকমলে কষিলে মধুপান
এবেঁ পাইঞা আহ্মে ব্রহ্ম গেআন।

:০: :০: :০:

ইড়া পিঙ্গলা সুসমনা সন্ধি
মন পবন তাত কৈল বন্দী। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

বস্তুত তান্ত্রিক আচার-পদ্ধতি বাঙালী সমাজে যে কতদূর বদ্ধমূল হয়েছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম নিজেই তার প্রমাণ। অন্যান্য বৈষ্ণব মতের সঙ্গে গৌড়ীয় মতের প্রধান পার্থক্য এই যে এতে রাধার স্থান খুব উচ্চে। এমন কি একথা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে রাধার মাহাত্ম্য কৃষ্ণের চাইতে বেশি। তিনি যদি কৃষ্ণের শক্তি-স্বরূপা হয়ে থাকেন তাহলে বলতে হয় তার মূলে তন্ত্রের প্রভাব দৃঢ়ভাবে ক্রিয়াশীল। যে সহজিয়া মতের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্মের তন্ত্রাশ্রিত শাখাটি বিশেষভাবে পুষ্টি লাভ করে তার চর্চ্চা চৈতন্যের অনেককাল পূর্ব্ব থেকে চালু ছিল। পুর্ব্বে বলা হয়েছে, 'সহজ বৈষ্ণব' রায় রামানন্দের দ্বারা স্বয়ং মহাপ্রভু প্রভাবিত হয়েছিলেন। সহজিয়া মতের প্রাবল্য চৈতন্যদেবের পরেও কি রকম ছিল নরহরি সরকার ঠাকুরের গৌর-নাগর ভাব তার উদাহরণ। এই সাহজিক প্রেমধর্ম্ম অবশ্যই তন্ত্রের মূল থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করেছিল ও বাংলাদেশে তার বিস্তৃত চর্চ্চা ছিল বলে চৈতন্য যখন প্রথম ধর্ম্মমত প্রচার করতে শুরু করেন অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা সন্দেহ করেছিল তিনি তান্ত্রিক ক্রিয়াতে রপ্ত।

কেহো বোলে আরে ভাই মদিরা আনিয়া
সভে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া।
কেহো বোলে ভাল ছিল নিমাঞি পণ্ডিত
তারে কেন নারায়ণ কৈল হেন চিত।

:০: :০: :০:

কেহো বোলে অরে ভাই সব হেতু পাইল
দ্বার দিয়া কীর্ত্তনের সন্দর্ভ জানিল।
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চকন্যা আনে
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা সভার সনে। চৈ-ভা, মধ্য, ৮

প্রাক্‌-চৈতন্য যুগের সমাজে তান্ত্রিক বামপন্থী সন্ন্যাসীর প্রাচুর্য ঘটায় চৈতন্যের প্রতি সাধারণ মানুষের এজাতীয় সন্দেহ অস্বাভাবিক ছিল না। এইসব

সন্ন্যাসীদের দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শ কি রকম ছিল চৈতন্যের জীবনেও একটি ঘটনায় তা বোধগম্য হয়। গঙ্গাতীরে ললিতপুর নামক স্থানে নিত্যানন্দ ও চৈতন্য এক গৃহস্থ সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন।

সন্ন্যাসী সন্তোষে করে বহু আশীর্ব্বাদ
ধন বংশ সুবিবাহ হউ বিদ্যালাভ।
প্রভু বোলে গোসাঞি এ নহে আশীর্ব্বাদ
হেন বোলে তোরে হউ কৃষ্ণের প্রসাদ।

:০: :০: :০:

হাসিয়া সন্ন্যাসী বোলে পূর্ব্বে যে শুনিল
সাক্ষাৎ তাহার আজি নিদান পাইল।
ভালরে বলিতে লোকে ঠেঙ্গা লইয়া ধায়
এ বিপ্রপুত্রের সেই মত ব্যবসায়।
ধনবর দিল আমি পরম সন্তোষে
কোথা গেল উপকার আরো আমা দোষে।
সন্ন্যাসী বোলয়ে শুন ব্রাহ্মণ কুমার
কেনে তুমি আশীর্ব্বাদ নিন্দিলে আমার।
পৃথিবীতে জন্মিয়া যে না কৈল বিলাস
উত্তম কামিনী যার না শুইল পাশ।
যার ধন নাহি তার জীবনে কি কাজ
হেন ধনবর দিতে পাও তুমি লাজ।
হইল বা বিষ্ণু ভক্তি তোমার শরীরে
ধন বিনা কি খাইবা বোল ত আমারে। চৈ-ভা, মধ্য, ১৯

সন্ন্যাসীর উক্তি থেকে বোঝা যায় কেন সে যুগে বৈষয়িকতার অতি ব্যাপ্তি ও সন্ন্যাস আদর্শের অবনতি ঘটেছিল। অতঃপর যখন

বামপন্থী সন্ন্যাসী মদিরা পান করে,
নিত্যানন্দ প্রতি তাহা কহে ঠারে ঠারে।

তখন চৈতন্য ও নিত্যানন্দ সে স্থান ত্যাগ করলেন।

ফলতঃ ধর্ম্মের আদর্শ অধোগামী হয়ে নিকৃষ্ট আচার-অনুষ্ঠান ও ভূত-প্রেতে বিশ্বাসে পর্য্যবসিত হয়েছিল। চৈতন্যের দেহে 'বায়ু দেহ মান্দ্য' ঘটলে লোকে

বলেছিল 'দানব অধিষ্ঠান' ঘটেছে, 'কেহ বোলে হৈল বুঝি ডাকিনীর কাম'
(চৈ-ভা, আদি, ৮)।

লোকে যে পূজা করতো তাও আধ্যাত্মিক প্রেরণায় নয়, বিষয় বুদ্ধির চালনায়—

ধন বংশ বাড়ুক করিয়া কাম্য মনে
মদ্যে মাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে। চৈ-ভা, অন্ত্য, ৪।

চৈতন্যদেব নিজেও বহুবার এরকম দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিহাস করেছেন।

প্রভু বোলে শ্রীধর তুমি যে অনুক্ষণ
হরি হরি বোল তবে দুঃখ কি কারণ।
লক্ষ্মীকান্ত সেবন করিয়া কেন তুমি
অন্নবস্ত্রে দুঃখ পাও কহ দেখি শুনি।
শ্রীধর বোলেন উপবাস ত না করি।
ছোট হউ বড় হউ বস্ত্র দেখ পরি।
প্রভু বোলে দেখিলাঙ গাঁঠি দশ ঠাঞি
ঘরে বোলে এই দেখিতেছি খড় নাঞি।
দেখ এই চণ্ডী বিষহরিবে পজিয়া
কেনা ঘরে খায় পরে সব নাগরিয়া। চৈ-ভা, আদি, ৮।

এই সব শাক্ত সন্ন্যাসী ব্যতীত অন্য উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় ছিলেন শৈব সাধকেরা। স্বয়ং মহাপ্রভু এঁদের দেখে একদা ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন—

একদিন আসি এক শিবের গায়ন
ডমরু বাজায় গায় শিবের কথন।
আইল করিতে ভিক্ষা শিবের মন্দিরে
গাইয়া শিবের গীত বেড়ি নৃত্য করে।
শঙ্করের গুণ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর
হইলা শঙ্কর মূর্তি দিব্য জটাধর। চৈ-ভা, মধ্য, ৮।

শৈব সাধকদের বেশভূষা খানিকটা অনুমিত হয় এই শ্লোক থেকে—

রুদ্রাক্ষ বিড়াল অক্ষ সুবর্ণ রজতে
বান্ধিয়া ধরিলা কণ্ঠে মহেশের প্রীতে। চৈ-ভা, অন্ত্য, ৫।

তাছাড়া জনমানস থেকে বৌদ্ধ-নাথপন্থী চিন্তাধারাও যে সম্পূর্ণ মুছে যায়নি তার

নিদর্শন স্বরূপ বলা যায় চৈতন্যের নিন্দুকেরা বলতেন—

আমি ব্রহ্ম আমাতেই বৈসে নিরঞ্জন
দাস প্রভু ভেদ বা করেন কি কারণ। চৈ-ভা, আদি,১১।

এবং

আপন শরীর মাঝে আছে নিরঞ্জন
ঘরে হারাইয়া ধন চায় গিয়া বন। চৈ-ভা, মধ্য, ৮।

কিন্তু চৈতন্য-পন্থা সম্ভবত সর্ব্বাধিক বাধা পেয়েছিল অন্যতর চিন্তা পদ্ধতির কাছে।

কেহ বোলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার
উদ্ধতের প্রায় নৃত্য এ কোন ব্যভার। চৈ-ভা, আদি, ৭।

সেই যুগে জ্ঞানযোগ প্রবল ছিল। এমন কি চৈতন্য ভক্তরাও সকলে এর হাত থেকে মুক্ত ছিলেন না। স্বয়ং অদ্বৈত মধ্যে একবার জ্ঞানযোগে ব্যাখ্যা শুরু করায় মহাপ্রভুর দ্বারা প্রহৃত হয়েছিলেন (চৈ-ভা, মধ্য, ১৯)। মোটকথা সেই যুগ ছিল শিক্ষা ও ধনগর্ব্বে দৃপ্ত, কিন্তু ভক্তিলেশহীন। চৈতন্যের জন্ম-পূর্ব্ব নবদ্বীপের বর্ণনা করে Kennedy লিখেছেন, সেই যুগ পরিবেশ ছিল 'Some what materialistic but highly intellectual'। তাঁর এই মত সত্য। সাধারণ লোকে পুণ্যকর্ম্ম বলতে কি বুঝতো তার আভাস পাই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধার খেদোক্তিতে—

কেনা কুশ ক্ষেত্রে বিধি বতেঁ কৈল দান
কাহার ফলিল পুষ্কর পুণ্য সিনান।
কাহাকে মিলিল আজি অষ্ট মহাসিধী
কাবেঁ হাথেঁ হাথেঁ নিআঁ বিধি দিল নিধী।
কেনা কেদার শির পরসিল করে
কেনা তপ তপিল বদরী বটেশ্বরে।
কে গাঅ তেজিল গঙ্গা সঙ্গত সাগরে
যা লআঁ কুঞ্জে কুঞ্জে বুলে গদাধরে। পৃ, ৮৫।

ধর্ম্মের এরূপ অবনতির কালে বহু ভণ্ড তপস্বীর আবির্ভাবে বিস্মিত হবার কিছু নেই। সমগ্র চৈতন্যভাগবতটি এজাতীয় ছদ্মবেশী সাধকের নিন্দায় আকীর্ণ। ধর্ম্মের নামে প্রতারণা সব যুগেই চলে, সে যুগে তা কিছু বেড়েছিল

বলে মনে হয়। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। চৈতন্য ভাগবতে পাই—

উদর ভরণ লাগি পাপিষ্ঠ সকলে
রঘুনাথ করি আপনারে কেহ বোলে।
কোন্ পাপী সব ছাড়ি কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া নারায়ণ।
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার।
রাঢ়ে আর এক মহা ব্রহ্মদৈত্য আছে
অন্তরে রাক্ষস বিপ্র কাচ মাত্র কাচে।
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় গোপাল
অতএব তারে সভে বোলেন শৃগাল। চৈ-ভা, আদি, ০।

জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলেও এরকম উক্তি আছে—

কোন দেবালয়ে কেহ সেই বৃত্তি করি
পরিবার পুষিবেক বৈষ্ণবরূপ ধরি।

*　　　*

নানা অলঙ্কারে কেহ দিব্য পরিচ্ছদে
দোলাএ ঘোড়াএ জাব মহান্ত সপদে।

মহাপ্রভু সম্ভবত এই কারণে একবার সনাতনকে বলেছিলেন—

তিন মুদ্রার ভোট গায় মাধুকুরী গ্রাস
ধর্ম্মহানি হয় লোকে করে উপহাস। চৈ-চ, মধ্য, ২০।

ভোট মানে ভোট কম্বল।

লোকের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার ধর্ম্মের এই অগৌরবের জন্য বহুলাংশে দায়ী। কোনো কোনো ক্ষেত্রে লৌকিক কুসংস্কার হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতো, যেমন—

একদিন মথুরার লোক প্রাতঃকালে
বৃন্দাবন হইতে আইসে করি কোলাহলে।

:০:　　　:০:　　　:০:

লোকে কহে কৃষ্ণ প্রকট কালিদহ জলে
কালিদহে নৃত্য করে ফণি রত্ন জ্বলে।

*　　　　*　　　　*

প্রাতঃকালে ভব্য লোক প্রভু স্থানে আইল
কৃষ্ণ দেখি আইলা প্রভু তাঁহারে পুছিল।
লোকে কহে রাত্রে কৈবর্ত্ত নৌকায় চড়িয়া
কালিদহে মৎস্য মারে দেউটি জ্বালিয়া।
দূর হৈতে তাহা দেখি লোকের হয় ভ্রম
কালিয় শরীরে কৃষ্ণ করেন নর্ত্তন। চৈ-চ, মধ্য, ১৮।

মহাপ্রভু যে আন্দোলন শুরু করেন তাতে ধর্ম্মকে এই নিন্দিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করবার জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল। স্বভাবতই তা প্রথম অবস্থায় অধিকাংশ ব্যক্তির মনঃপূত হয়নি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বীকার করেছেন মহাপ্রভুর ঈশ্বরত্বে সকলে নিঃসন্দেহ ছিল না।

শাস্ত্র লোকাতীত যেই যেই ভাব হয়
ইতর লোকের তাতে না হয় নিশ্চয়। চৈ-চ, অন্ত্য, ১৪।

ভক্তি বাদ তখন প্রায় বর্জ্জিত হয়েছিল সমাজ থেকে।

অতি বড় সুকৃতী সে স্নানের সময়
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়। চৈ-ভা, আদি, ২।

চৈতন্য এ অবস্থার প্রতিরোধে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ফলে 'ন্যাসী হইয়া মদ্য পিয়ে স্ত্রীসঙ্গ আচার' (চৈ-ভা, মধ্য, ১৯) এমন ব্যক্তিরাই শুধু নয়, বহু সম্ভ্রান্ত সজ্জনও চৈতন্য প্রবর্ত্তিত মতকে বিদ্রূপ করেছেন। বৃন্দাবনদাসের বর্ণনানুযায়ী এঁরা প্রায়শঃ বলতেন

এ বামুনগুলা রাজ্য করিবেক নাশ
ইহা সভা হৈতে হৈব দুর্ভিক্ষ প্রকাশ।
এ বামুনগুলা সব মাগিয়া খাইতে
ভাবকীর্ত্তন করি নানা ছলা পাতে।

*　　　　*　　　　*

কেহ বোলে যদি ধান্যে কিছু মূল্য চড়ে
তবে এগুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে। চৈ-ভা, আদি, ১১।

কেহ বোলে কালি হউ যাইব দেয়ানে
কাঁকালি বান্ধিয়া সব নিব জনে জনে।
যেনা ছিল রাজ্য দেশে আনিঞা কীর্ত্তন
দুর্ভিক্ষ হৈল সব গেল চিরন্তন।
দেবে হরিলেক বৃষ্টি জানিল নিশ্চয়
ধান্য মরি গেল কড়ি উৎপন্ন না হয়। ঐ, মধ্য, ৮।

কেহ বোলে কলিযুগে কিসেব বৈষ্ণব
যত দেখ হেব পেটপোষাগুলা সব।
কেহ বোলে এগুলাবে বান্ধি হাত পায়
জলে ফেলি জীয়ে যদি তবে ধন্য গায়। ঐ, মধ্য, ২৩।

চৈতন্য তাব আজীবন সাধনাব দ্বাবা এই বিরূপতা অনেকটা জয় করতে পেবেছিলেন। ধর্মেব ম্লানি অাচাবাদি দবীভূত কবে তিনি মহত্তম আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যাব মূলমন্ত্র ছিল—

বিদ্যাধন প্রতিষ্ঠায় কিছু নাহি করে
বৈষ্ণবেব প্রসাদে সে ভক্তি ফল ধরে।

সে যুগে একজন ভক্ত বৈষ্ণবেব জীবনে বৃন্দাবন যাত্রা যে কতদূর কামনার বিষয় ছিল তাব পবিচয় নবোত্তম দাসেব নিচেব পদটিতে পাই—

হবি হবি আব কি এমন দশা হৈব।
এ ভব সংসাব ত্যজি পবম আনন্দে মজি
আব কবে ব্রজভূমে যাইব।

*　　*　　*

কবে গোবর্ধন গিবি দেখিব নয়ান ভবি
বাধা কুণ্ডে কবে হৈব বাস।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে এ দেহ পতন হবে
আশা কবে নরোত্তম দাস॥

কিন্তু চৈতন্য প্রবর্ত্তিত এই আন্দোলনের তীব্রতা কতকাল স্থায়ী হয়েছিল বলা দুষ্কব। চৈতন্যেব মৃত্যুব অব্যবহিত পবেই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ভাঙন ধরার ইঙ্গিত পাই। বৃন্দাবন দাস বলছেন—

নিত্যানন্দ অদ্বৈত অভেদ প্রেম জ্ঞান
এই অবতারে জানে সেই ভাগ্যবান।
যে কিছু কলহ লীলা দেখহ দোঁহার
সে সব অচিন্ত্যরঙ্গ ঈশ্বর ব্যভার।
এ দুইর প্রীতি যেন অনন্ত শঙ্কর
দুই কৃষ্ণ চৈতন্যের প্রিয় কলেবর।
যে না বুঝি দোঁহার কলহপক্ষ ধরে
এক বন্দে আর নিন্দে সেই জন মরে। চৈ-ভা, মধ্য, ৬।

*　　　*　　　*

বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে যে দেখহ গালাগালি
পরমার্থে নহে ইথে কৃষ্ণ কুতূহলী।
সত্যভামা রুক্মিনীরে গালাগালি হেন
পরমার্থে এক তা না দেখি ভিন্ন হেন। ঐ, অন্ত্য, ৪।

তবু যতই বিভেদ থাকুক বৈষ্ণবধর্মের শুভপ্রভাব একান্ত ব্যর্থ হয়নি। চৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে দেশ থেকে মদ্যপানাদি অনেক কুপ্রথা দূর হয়েছিল। আচার্য যদুনাথ সরকার বলেছেন, This is the homage that the vice pays to Vaisnavism (History of Bengal, vol II, P. 220)।

জাতিভেদ

চৈতন্যদেব কি সচেতন ভাবে জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা করেছিলেন?

চৈতন্য-জীবনী বিচার করলে এ মত গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। একথা সত্য যে তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজে জাতিভেদ প্রথার কড়াকড়ি কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। বৃন্দাবনদাস লিখেছেন—

যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে। চৈ-ভা, মধ্য, ২০।

তাহলেও বৈষ্ণব সমাজে এ উদার আদর্শ দীর্ঘ স্থায়ী হয়নি। মহাপ্রভু হরিভক্তি পরায়ণ চণ্ডালকে দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলেছেন। কিন্তু সমগ্রভাবে সমাজে জাতিভেদ

প্রথাকে আঘাত করা তাঁর লক্ষ্য ছিল কিনা সন্দেহের বিষয়। যেমন বুদ্ধদেব তেমনি মহাপ্রভু সম্বন্ধেও বলা যায় সামাজিক প্রথাসমূহের পরিবর্তন তাঁদের প্রবর্তিত আন্দোলনের গৌণফল মাত্র। মুখ্যত তাঁরা ব্যক্তিমানবের মুক্তির পথ খুঁজেছিলেন। মধ্যযুগে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে যে সকল মরমী সাধকের আবির্ভাব হয়েছিল তাঁদের প্রায় সকলেই উদার ধর্ম্মনৈতিক আদর্শ প্রচারের দ্বারা জাতিভেদের মূল কিছুটা শিথিলিত করতে সক্ষম হন। কিন্তু মহাপ্রভু জাতিভেদ প্রথা ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে আক্রমণ করেননি। স্মরণ রাখা কর্তব্য, চৈতন্যের কাছে সাধ্যসাধনতত্ত্ব নির্ণয় কালে রায় রামানন্দ স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয় একথা বলে নিচের শ্লোকটি শোনান—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্ত তোষ-কারণম্॥

ঈশান নাগর 'অদ্বৈত প্রকাশে' বলেছেন যে তিনি একবার উপবীত ত্যাগ করায় মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁকে পুনরায় উপবীত দিয়ে বলেছিলেন 'যতেসূত্র চিত্তশুদ্ধিতা'।

হিন্দু মুসলমান

ষোড়শ সপ্তদশ শতকেও হিন্দু-মুসলমানে যথেষ্ট বৈরিতা ছিল। অবশ্য বিরোধের প্রাথমিক তীব্রতা আর ততটা ছিল না। বিদ্যাপতি তার কীর্তিলতা কাব্যে যেমন বলেছেন

গোবম্ভন বধে দোস ন মানথি
পরপুরনারি বন্দ কএ আনথি।
হস হরথে কণ্ঠ হাস হজহিঁ
তরুণ তুরুক বাচা সএ সহসহি।

—'গো ব্রাহ্মণ বধে কোন দোষ দেখে না, তারা পরের পুরনারীকে বন্দী করে আনে, অট্টহাসি হেসে আনন্দে কথা কইতে কইতে তরুণ তুর্কীরা চলে যায়'— এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটেছিল ইতিমধ্যে। ইলিয়াস সাহী বংশ দেশে স্থায়ী রাজশক্তির পত্তন করায় শান্তি ফিরে এসেছিল ও অনেক মুসলমান নৃপতি ও তাঁদের অমাত্যেরা হিন্দু কবিদের কাব্য পাঠে আগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন। কিন্তু বিজয়ী ও বিজিতের ব্যবধান তাতে বিশেষ কমেনি। মুসলিম সম্প্রদায়ে

হিন্দুর প্রতি ঘৃণা নিশ্চই বিদ্যমান ছিল, না হলে হরিদাসকে তাঁর স্বজাতিবৃন্দ বলতেন না—

কতভাগ্যে দেখ তুরি হৈয়াহ যবন
তবে কেনে হিন্দুর আচারে দেহ মন। চৈ-ভা, আদি,১১।

এমন কি হোসেন শাহাও হিন্দুরনির্যাতনের অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন না।

যে হুসেন সাহা সর্ব্ব উড়িয়ার দেশে
দেবমূর্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে। চৈ-ভা, অন্ত্য, ৪।

অবশ্য শাসকেরা সবসময় যে ইচ্ছা করে অত্যাচার করতেন তা নয়, কখনো কখনো পাকে চক্রে করতে বাধ্য হতেন। চৈতন্য চরিতামৃতে (মধ্য, ২৫) হুসেন শাহা সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। হুসেন খাঁ সৈয়দ প্রথম জীবনে 'গৌড় অধিকারী' সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে কর্মচারী ছিলেন। কোনো সময়ে তাঁর কাজে ছিদ্র পেয়ে সুবুদ্ধি রায় তাঁকে চাবুক মেরেছিলেন। পরে হুসেন খাঁ রাজা হয়ে 'সুবুদ্ধি রাযেরে তিহোঁ বহু বাড়াইল'! কিন্তু হুসেন শাহের পত্নী তাঁর দেহে আঘাত চিহ্ন দেখে তাঁকে বললেন সুবুদ্ধি রায়ের প্রাণ নিতে। 'রাজা কহে আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা'। তবু স্ত্রীর প্ররোচনায় তিনি বাধ্য হয়ে সুবুদ্ধি রায়ের জাতিনাশের সঙ্কল্প করলেন, 'করোযাব পানি তার মুখে দেয়াইলা'। সুবুদ্ধি রায় বিষয় ত্যাগ করে বারাণসী ধামে চলে যান। পণ্ডিতেরা তাঁকে উপদেশ দিলেন—তপ্ত ঘৃত খাঞা ছাড় প্রাণ। শুধু মহাপ্রভু বললেন 'নিরন্তন কৃষ্ণনাম কর সংকীর্ত্তন'।

হুসেন শাহের মতো উদারহৃদয় নৃপতি সবকালেই বিরল। সাধারণ মুসলমান শাসকেরা ও তাঁদের অনুচরবৃন্দ নির্মম অত্যাচারের দ্বারা দেশময় আতঙ্ক ছড়িয়েছিলেন। নির্যাতনের ফলে হিন্দুরা কিভাবে দেশত্যাগী হতেন তার একটি জীবন্ত বর্ণনা আছে চৈতন্য ভাগবতে (মধ্য, ৯)। মহাপ্রভু একদিন তাঁর পূর্ব্বজীবন বৃত্তান্ত বলতে গাললেন।

গঙ্গাদাসে দেখি বোলে তোর মনে জাগে
রাজভয়ে পলাইস যবে নিশাভাগে।
সর্ব্বপরিকর সনে আসি খেযাঘাটে
কোথাহ নাহিক নৌকা পড়িলা সঙ্কটে।
রাত্রি শেষ হইল তুমি নৌকা না পাইয়া

কান্দিতে লাগিলা অতি দুঃখিত হইয়া।
মোর আগে যবনে স্পর্শিবে পরিবার
গাঙ্গে প্রবেশিতে মন হইল তোমার।
তবে আমি নৌকা নিয়া খেয়ারির রূপে
গঙ্গায় বাহিয়া যাই তোমার সমীপে।
তবে নৌকা দেখি তুমি সন্তোষ হইলা
অতিশয় প্রীত করি কহিতে লাগিলা।
অরে ভাই আমারে রাখহ এইবার
জাতি প্রাণ ধন দেহ সকলি তোমার।
রক্ষা কর পরিকর সঙ্গে কর পার
এক তঙ্কা এক জোড় বস্ত্র সে তোমার।

চৈতন্য চরিতামৃতেও এ রকম দুটি বিবরণ পাই

দস্যুবৃত্তি করে রামচন্দ্র রাজায় না দেয় কর
ক্রুদ্ধ হঞা ম্লেচ্ছ উজির আইল তার ঘর।
আসি সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল
অবধ্য বধ করি ঘরে মাংস রাঁধি খাইল।
স্ত্রীপুত্র সহিত রামচন্দ্রের বান্ধিয়া
তার ঘর গ্রাম লুঠে তিনদিন রহিয়া।
সেই ঘরে তিনদিন অবধ্য রন্ধন
আর দিন সবা লঞা করিল গমন।
জাতি ধন মানের সব নষ্ট হৈল
বহুদিন পর্যন্ত গ্রাম উজার করিল। অন্ত্য, ৩।

অন্নকূট নাম গ্রামে গোপালের স্থিতি
রাজপুত লোকের সেই গ্রামেতে বসতি।
একজন আসি রাত্রে গ্রামীকে বলিল
তোমার গ্রাম মারিতে তুড়ুকধারী সাজিল।
আজ রাত্রে পালাও গ্রামে না রহ একজন
ঠাকুর লইয়া ভাগ কাল আসিবে যবন। মধ্য, ১৮।

এসমস্ত কারণে একশ্রেণীর লোক চৈতন্যদেবের ধর্ম্মান্দোলনকে সুনজরে দেখেন নি। তাঁদের আশঙ্কা ছিল চৈতন্যের কার্য্যাবলীতে শাসকেরা রুষ্ট হলে সমগ্র হিন্দু সমাজকে তার ফলভোগ করতে হবে। চৈতন্যভাগবতে বলা হয়েছে—

চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ ঘরে
নিশা হৈলে হরি নাম গায় উচ্চস্বরে।
শুনিঞা পাষণ্ডী বোলে হইল প্রমাদ
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ।
মহাতীব্র নরপতি যবন ইহার
এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার।
কেহ বোলে এ বামনে এই গ্রাম হৈতে
ঘর ভাঙ্গি ঘুচাই ফেলাই নিঞা স্রোতে।
এ বামনে ঘুচাইল গ্রামের মঙ্গল
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল। আদি, ২।

এবং

কেহ বোলে আরে ভাই পড়িল প্রমাদ
শ্রীবাসের বাদে হৈল দেশের উৎসাদ।
আজি মুঞি দেয়ানে শুনিলুঁ সব কথা
রাজার আজ্ঞায় দুই নাও আইসে তথা।
শুনিলেক নদীয়ায় কীর্ত্তন বিশেষ
ধরিয়া নিবারে হৈল রাজার আদেশ।
যেতে দিকে পলাইব শ্রীবাস পণ্ডিত
আমা সভা লৈয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত।
তখনে বলিলুঁ মুঞি হৈয়া মুখর
শ্রীবাসের ঘর ফেলি গাঙ্গের ভিতর।
তখনে না কৈলে ইহা পরিহাস জ্ঞানে
সর্ব্বনাশ হয় এবে দেখ বিদ্যমান। মধ্য, ২।

তাহলেও হিন্দুর স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অপহৃত হয়েছিল ভাববার সঙ্গত কারণ নেই। হিন্দুদের নির্ব্বিচারে কণ্ঠরোধ করা হলে চৈতন্য বলতে পারতেন না—

সন্ধ্যাতে দিউটি সবে জ্বাল ঘরে ঘরে
দেখি কোন্ কাজি আসি মোরে মানা করে। চৈ-চ, আদি, ১৭।

আর কাজিও এরপর তাঁকে বলতেন না—

গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা
দেহ সম্বন্ধ হইতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা।

তাছাড়া চৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্বও দুইসম্প্রদায়ের সম্পর্ক সহজতর করে এনেছিল। চৈতন্য চরিতামৃতে একজন মুসলমান শাসকের কথা পাচ্ছি—

মদ্যপ যবন রাজার আগে অধিকার
তার ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার।
পিছলদা পর্য্যন্ত সব তার অধিকার
তার ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার।

তাঁরও চিত্ত পরিবর্ত্তিত হলো মহাপ্রভুকে দেখে, তখন

জলদস্যু ভয়ে সেই যবন চলিল
দশ নৌকা ভরি বহু সৈন্য সঙ্গে নিল।
মন্ত্রেশ্বর মহানদী পার করাইল
পিছলদা পর্যন্ত সেই যবন আইল। চৈ-চ, মধ্য, ১৬।

আর একজন মুসলমান কবি, লাল মামুদ, লিখে গেছেন—কত লোহার মানুষ সোনা হল গৌর অবতারে।

রাজশক্তি, অরাজকতা

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যে বহুস্থলে রাজাকে অত্যাচারী ও নির্দয়রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। রাধা কৃষ্ণকে বলেছেন—

এবেঁ রাজা ধনের কাতর
চাহে যবেঁ দুধে দিবোঁ কর। পৃ, ১৯।
রাজা বড় খরতর নাহি শুণ কথা
লঘু নটক পাইলে কাটে তার মাথা। পৃ, ২৮।
রাজা খরতর পাটে আতি দুরুবার
তাক মোর বড় ভয় এড় একবার। পৃ, ৫০।

এসব মন্তব্য থেকে প্রতিভাত হয় রাজশক্তি। জনসাধারণের মনে ভয় ও বিতৃষ্ণা জাগাতো। অনেকে বলতে পারেন, রাধিকার মন্তব্য এক পৌরাণিক রাজার

উদ্দেশ্যে মাত্র এবং তিনি স্বয়ং কংস। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাসের সমসাময়িক কালের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিচার করলে এই সব উক্তির পেছনে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা নিহিত ছিল তা বোঝা যায়। মুসলিম বিজয়ের পর থেকে মুঘল শাসন প্রবর্ত্তনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলা দেশে কোনো স্থায়ী শান্তি ছিল না। একের পর এক রাজবংশের অভ্যুত্থান ঘটছিল এবং অতি সামান্য কাল শাসন করেই তাঁরা বিলুপ্ত হতেন। রাজপ্রাসাদ সমূহ ছিল চক্রান্ত, নারকীয় সম্ভোগ এবং মৃত্যুর বিভীষিকায় পূর্ণ। স্বভাবত, যাঁরা সিংহাসন অধিকার করতেন, অত্যাচার, লুণ্ঠন ও সন্ত্রাসের দ্বারা তাকে টিকিয়ে রাখবার চেষ্টা করতে হতো তাঁদের। দেশের এই অবস্থায় রাধার পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তি সমূহকে রাজশক্তির যথার্থ পরিচয় হিসাবে গ্রহণ করতে বাধা নেই।

রাজা শাসন করতেন তাঁর কর্ম্মচারী মারফৎ। খাজনা আদায় করতেন জমিদারেরা। খাজনা বাহকদের অধ্যক্ষের নাম ছিল 'আরিঙ্গা প্রধান'।

গোপাল চক্রবর্ত্তী নামে এক ব্রাহ্মণ—
মজুমদারের ঘরে সেই আরিঙ্গা প্রধান। চৈ-চ, অন্ত্য, ৩।

এই সকল রাজকর্মচারী ও জমিদারের অনুচরবৃন্দ যে কতদূর অত্যাচারী হতেন মুকুন্দরামের আত্মপরিচয়াত্মক অংশটি তার সুন্দর নিদর্শন। রাজা কি ভাবে শাস্তি দিতেন নিচের উপমাটিতে তার উল্লেখ আছে,

দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায। চৈ-চ, মধ্য, ২০।

বলাবাহুল্য এটি সাধারণ শাস্তির নমুনা, অন্যবিধ শাস্তি ছিল আরো ভয়ঙ্কর। কেবল প্রজা সাধারণ নয়, মাঝে মাঝে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও বিপন্ন হয়ে শাস্তি ভোগ করতেন। রায় রামানন্দের ভ্রাতা গোপীনাথ পট্টনায়ক পর্যন্ত একবার এরকম শাস্তি ভোগ করেছিলেন।

একদিন লোক আসি প্রভুরে নিবেদিল
গোপীনাথে বড় জানা চাঙ্গে চড়াইল।
তাল খড়্‌গ পাতি উপরে ভারি দেবে
প্রভু রক্ষা করেন যবে তবে নিস্তারিবে।

রাজা প্রতাপরুদ্র দেব একথা জানতেন না। পরে শুনে বললেন—

রাজা কহে আমি তারে দুঃখ নাহি দিয়ে
চাঙ্গে চড়া খড়্‌গে ডারা আমি না জানিয়ে।

পুরুষোত্তম জানারে তিঁহ কৈল পরিহাস
সেই জানা মিথ্যা তারে দেখাইল ত্রাস। চৈ-চ, অন্ত্য ৯।

কোনো উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী কর্ম ত্যাগ করলে সেটাও অপরাধ বলে গণ্য হতো, রূপসনাতনের কাহিনীতে তা প্রমাণিত হয়। মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পর 'দুই ভাই বিষয়ত্যাগের উপায় সৃজিল'। কিন্তু তাঁরা জানতেন চাকুরী ত্যাগ করলেও সহজে নিষ্কৃতি পাবেন না, শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য 'দণ্ডবন্ধ' দিতে হবে। রূপ তখন নৌকা ভরে ধন নিয়ে গৃহে গেলেন।

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দিল তার অর্ধধনে
এক চৌঠি ধন দিল কুটুম্ব ভরণে।
দণ্ডবন্ধ লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিল
ভাল ভাল বিপ্রস্থানে স্থাপ্য রাখিল।
গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ হাজারে
সনাতন ব্যয় করে রহি মুদি ঘরে। চৈ-চ, মধ্য, ১৯।

সনাতনকে বন্দী করা হয়েছিল। কিন্তু যেমন একালে তেমনি সেকালেও ঘুষ দিয়ে আইনের বিধান এড়ানো দুরূহ ছিলনা। সনাতন মুসলমান কারা-রক্ষককে বললেন

পূর্ব্বে আমি তোমার করিয়াছি উপকার
তুমি আমা ছাড়ি কর তার প্রত্যুপকার।
পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিব করোঁ অঙ্গীকার
পুণ্য অর্থ দুই লাভ হইবে তোমার।
তবে সেই যবন কহে শুন মহাশয়
তোমারে ছাড়িয়ে কিন্তু করি রাজ ভয়।
সনাতন কহে তুমি না কর রাজ ভয়
দক্ষিণ গিয়াছে যদি নেউটি আইসয়।
তাহাকে কহিও সেই বাহ্য কৃত্যে গেল
গঙ্গার নিকটে গঙ্গা দেখি ঝাঁপ দিল।
অনেক দেখিল তার লাগি না পাইল
দাঁড়ুকা সহিত ডুবি কাঁহা বহি গেল।

কিছু ভয় নাহি আমি এদেশে না রব
দরবেশ হঞা আমি মক্কায় যাইব।
তথাপি যবন মন প্রসন্ন না দেখিল
সাত হাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈল।
লোভ হইল যবনের মুদ্রা দেখিয়া
রাত্রে গঙ্গা পার কৈল দাঁড়ুকা কাটিয়া। চৈ-চ, মধ্য,২০।
[দাঁড়ুকা অর্থ বেড়ি]

দেশের শাসনতন্ত্রে অব্যবস্থার ফলে অনেক নিগ্রহ ভোগ করতে হতো জনসাধারণকে। দুই রাজায় বিরোধ থাকলে একদেশ থেকে আরেক দেশে যাত্রা হতো বিপজ্জনক। মহাপ্রভু নীলাচল যাত্রার অভিপ্রায় প্রকাশ করলে ভক্তগণ তাঁকে বললেন—

তথাপিহ হইয়াছে দুর্ঘট সময়
সে রাজ্যে এখন কেহো পথ নাহি বয়।
দুই রাজায় হইয়াছে অত্যন্ত বিবাদ
মহাযুদ্ধ স্থানে স্থানে পরম প্রমাদ। চৈ-ভা, অন্ত্য, ২।

পথে রামচন্দ্র খাঁও তাঁকে একথা বলেছিলেন—

সবে প্রভু হইয়াছে বিষম সময়
সেদেশে এদেশে কেহ পথ নাহি বয়।
রাজারা ত্রিশূল পুঁতিয়াছে স্থানে স্থানে
পথিক পাইলে যাসু বলি লয় প্রাণে। ঐ, অন্ত্য, ২।

লোকে তীর্থযাত্রা করতে বেরোলেও নিরাপদ বোধ করতো না। সঙ্গে লোকজন বেশি থাকলে অনেক সময় শাসকেরা তা সন্দেহের চোখে দেখতেন। রামকেলি গ্রামে রূপ-সনাতন চৈতন্যদেবকে এই বলে অনুরোধ করেছিলেন—

ইহা হইতে চল প্রভু ইহা নাহি কাজ
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ।
তথাপি যবন জাতি না করি প্রতীতি
তীর্থ যাত্রায় এত সংঘট, ভালো নহে রীতি। চৈ-চ,মধ্য ১।

পথে সব চেয়ে ভয়ঙ্কার বিপদ ছিল জল-দস্যুদের। নীলাচল যাত্রার পথে মহাপ্রভুর আজ্ঞায় ভক্ত মুকুন্দ কীর্তন শুরু করলে—

অবুধ নাইয়া বোলে হইল সংশয়
বুঝিলাঙ্য আজি আর প্রাণ নাহি রয়।
কূলে উঠিলে বাঘে লইয়া পলায়
জলে পড়িলে সে বোল কুম্ভীরেই খায়।
নিরন্তর এ পানিতে ডাকাইত ফিরে
পাইলেই ধন প্রাণ দুই নাশ করে।
এতেকে যাবৎ উড়িয়ার দেশ পাই
তাবৎ নীরব হও সকল গোসাঞি। চৈ-ভা, অন্ত্য, ২।

বাংলাদেশে এই সব জলদস্যুদের উৎপীড়নের কথা ইবন্ বতুতা তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এদের নিষ্ঠুরতার দ্বারা মানুষের জীবন কি ভাবে বিনষ্ট হতো আলাওলের আত্মকাহিনীতে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাই। বিশেষত পোর্তুগীজদের অত্যাচারের কথা অনেক গ্রন্থেই আছে। মুকুন্দরাম লিখেছেন 'রাত্রিতে বাহিযা যাই হার্মাদের ডরে' এবং রামগোপাল দাসের শাখানির্ণয়ে কবি লোচন দাস সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

গুরুর অর্থে বিকাইলা ফিরিঙ্গি সদন

সেযুগে দেশান্তরে যাত্রাকালে পথকর দিতে হতো। শ্রীচৈতন্য যখন তীর্থযাত্রায় গিয়েছিলেন শিবানন্দ সেন তাঁর পথকর মিটিয়ে দিতেন। চৈতন্য চরিতামৃতে আছে—

শিবানন্দ সেন করে ঘাটি সমাধান। মধ্য, ১৬।

যাঁরা পথকর আদায করতেন তাঁদের নাম ছিল ঘাটিয়াল, যথা,

ঘাটিয়াল প্রবোধ দেন সবারে বাসস্থান। চৈ-চ, মধ্য, ১৬।

নৌকায় নদী পার হবার সময়ও কর দিতে হতো। শিবানন্দ সেনের সঙ্গে সব সময় একটি কুকুর থাকতো।

একদিন এক নদী সবে পার হৈতে
উড়িয়া নাবিক কুক্কুর না চড়ায় নৌকাতে।
কুক্কুর রহিলা শিবানন্দ দুঃখী হৈলা
দশপণ কড়ি দিঞা কুক্কুর পার কৈলা। চৈ-চ, অন্ত্য, ১।

যারা এ সব কর গ্রহণ করতো তাদের সচরাচর বলা হতো দানী। দানীদের উৎপীড়ন এককালে দেশব্যাপী কুখ্যাতি অর্জন করেছিল নিশ্চয়ই, না হলে

চৈতন্য ভাগবতকার এই উপমা প্রয়োগ করতেন না—

কেহ বোলে দেখা হৈলে না দেন এড়িয়া
মহাদানী প্রায় যেন রাখেন ধরিয়া। আদি, ৮।

তীর্থযাত্রী চৈতন্যকেও তারা রেহাই দেয়নি। পথে এক স্থানে—

কথোদুর গেলে মাত্র দানা দুরাচার
রাখিলেক দান চাহে না দেয় যাইবার। চৈ-ভা, অন্ত্য, ২।

বস্তুত, দান খণ্ডের আখ্যায়িকার পেছনে দানীদের অত্যাচারের জীবন্তস্মৃতি বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের শ্রেষ্ঠতম অংশ, দানখণ্ডে কৃষ্ণ দানীরূপে রাধাকে আটকে রেখে ছিলেন। এটি স্বতন্ত্র একটি আখ্যায়িকারূপেও বাংলা-দেশে জনপ্রিয়। আখ্যায়িকাটির আধ্যাত্মিক তাৎপর্য যাই হোক না কেন, দানীদের পথিক-নির্যাতনের বাস্তব অভিজ্ঞতা যে এই কাহিনীর কল্পনামূলে নিহিত আছে তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণ রাধাকে বলেছেন তিনি রাজার কাছ থেকে দান সংগ্রহের ভার পেয়েছেন—

বাটদান হাটদান লইলোঁ রাজঘরে
তে কারণে আইলোঁ মোএঁ যমুনার তীরে। পৃ, ১৬।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সাক্ষ্যে জানা যায় দানীদের কর সংগ্রহের স্থানকে বলা হতো 'কুত ঘর' এবং তারা যথারীতি হিসাব রাখতো। কৃষ্ণের কাছে দানের দাবি শুনে রাধা পাল্টা অভিযোগ করেছিলেন যে তিনি জাল হিসাব রেখেছেন—

হাটের বাটের দান চাহে ভীনে ভীনে
মিছা পাঞ্জী মেলি বোলে লিখন প্রমাণে। পৃ, ১৬।

দানীদের আইন সম্মত অত্যাচার ছাড়াও ছিল চোর-বাটপাড়-দস্যুর উপদ্রব। প্রসঙ্গত বলা যায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চোর-ডাকাতের উল্লেখ প্রাচুর্য বিস্ময়কর। দেশের সর্ব্বত্র এদের অত্যাচারের কথা সুবিদিত না হলে এই প্রসঙ্গ সাহিত্যে ঘন ঘন প্রবেশ লাভ করতো না।

চৈতন্য ভাগবতে বলা হয়েছে বাল্যকালে দুজন চোর চৈতন্যকে চুরি করে নিয়ে যেতে চেয়েছিল—

একদিন প্রভুরে দেখিয়া দুই চোরে
যুক্তি করে কার শিশু বেড়ায় নগরে।

প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখি দিব্য অলঙ্কার
হরিবারে দুই চোরে চিন্তে পরকার।
বাপ বাপ বলি এক চোর লৈল কোলে
এতক্ষণ কোথা ছিলে আর চোর বোলে।

*　　　*　　　*

কেহ মনে ভাবে মুঞি নিমু তাড় বালা
এই মতে দুই চোরে খায় মনকলা। আদি, ৩।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত 'মায়ামুগ্ধ চোর' চৈতন্যের ছলনায় পড়ে পালাতে অসমর্থ হয়।

যারা ডাকাতি করতো তাদের মধ্যে উচ্চ বংশ-সম্ভূত অনেক ব্যক্তিও ছিল। বৃন্দাবন দাস বলেছেন নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণ কুমার ডাকাতি করে জীবিকা নির্বাহ করতো। সে স্থির করেছিল নিত্যানন্দের অলঙ্কার লুঠ করবে। কিন্তু রাত্রিতে তার দলবল সহ সে মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। পরদিন সর্দার বললো—

বুঝিলাঙ্ঘ্য চণ্ডী আসি মোহিলা আপনে
বিনি চণ্ডী পূজিয়া গেলাঙ যে কারণে।
ভাল করি আজি সভে মদ্য মাংস দিয়া
চল সভে এক ঠাঞি চণ্ডী পূজি গিয়া।
এতেক করিয়া যুক্তি সব দস্যুগণ
মদ্য মাংস দিয়া সবে করিল পূজন।
আরদিন দস্যুগণ কাচি নানা অস্ত্র
আইলেক বীর ছাঁদে পরি নীল বস্ত্র। চৈ-ভা, অন্ত্য, ৫।

চোর ও ডাকাত ছাড়া বাটোয়ার অর্থাৎ বাটপাড়ের উপদ্রবও ছিল। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে রাধা কৃষ্ণের নিন্দা করে বলেছেন—

এবেঁ বাটে বাটোয়াও হৈলা কাহ্নাঞিঁ। পৃ, ২৩।

এবং

দুরুজন কাহ্নাঞিঁ গুণ এবেঁ পাড়ে বাটে। পৃ. ৫৮।

বাটোয়ারেরা অনেক সময় সন্ন্যাসিবেশ ধারণ করে থাকতো—

যেন তপস্বীর বেশে থাকে বাটোয়ার। চৈ-ভা, মধ্য, ২৫।

বাটোয়ারদের উপদ্রব কি রকম ছিল নিচের গল্পটি থেকে তা বোঝা যাবে।

একদা বৃন্দাবনে ভ্রমণ কালে এক গোপের বংশীধ্বনি শুনে মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হলেন।

অচেতন হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িলা
মুখে ফেণা পড়ে নাসায় শ্বাসরুদ্ধ হইলা।
হেনকালে তাঁহা আসোয়ার দশ আইল
ম্লেচ্ছ পাঠান ঘোড়া হইতে উত্তরিল।
প্রভুকে দেখিয়া ম্লেচ্ছ করয়ে বিচার
এই যতি পাশ ছিল সুবর্ণ অপার।
এই পঞ্চ বাটোয়ার ধুতুরা খাওয়াইয়া
সারি ডারিয়াছে যতির সব ধন লঞা।
তবে সেই পাঠান পঞ্চজনেরে বান্ধিল
কাটিতে চাহে গৌড়িয়া সব কাঁপিতে লাগিল।
সেই কৃষ্ণদাস রাজপুত নির্ভয় বড়
সেইত বিপ্র নির্ভয় মুখে বড় দড়।
বিপ্র কহে পাঠান তোমার পতিসার দোহাই
চল তুমি আমি তোমার সিকদার পাশে যাই।
কৃষ্ণদাস কহে আমার ঘর এই গ্রামে
শতেক তুড়কী আছে দুইশত কামানে।
এখনি আসিবে সবে আমি যদি ফুকারি
ঘোড়া পিড়া লুঠি লবে তোমা সবে মারি।
গৌড়িয়া বাটপাড় নহে তুমি বাটপাড়
তীর্থবাসী লুট আর চাহ মারিবার।
শুনিয়া পাঠান মনে সঙ্কোচ হইল
হেনকালে মহাপ্রভু চেতন পাইল। চৈ-চ, মধ্য, ১৮।

বোধহয় তখনকার যুগে বাটপাড় হিসাবে বাঙালীর কুখ্যাতি ছিল বেশি। অন্ততঃ কৃষ্ণদাস কবিরাজের একটি উক্তি থেকে এই সন্দেহ গাঢ় হয়। জগদানন্দ যেতে চাইলে মহাপ্রভু তাঁকে উপদেশ দিলেন

বারাণসী পর্যন্ত স্বচ্ছন্দ যাবে পথে
আগে সাবধান যাইহ ক্ষত্রিয়াদি সাথে।

কেবল গৌড়িয়া পাইলে বাটপাড় করি বান্ধে

সব লুঠি লয় রাখে বড়ই প্রমাদে। চৈ-চ, অন্ত্য, ১৩।

তবে, মধ্যযুগে বাটপাড়ের উপদ্রব একা বাংলা দেশেরই বিশেষত্ব নয়। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ অবধি ইযোরোপের কোনো দেশই high way men-এর অত্যাচার থেকে মুক্ত ছিল না।

চোর-বাটপাড় ছাড়া আর এক ধরণের দুর্বৃত্তের কথা বলা দরকার, এরা ঠক ও জুয়াচোর। মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য গমনকালে নিত্যানন্দ তাঁকে বলেছিলেন—

এক দুই সঙ্গে চলুক না পড হঠরঙ্গে। চৈ-চ, মধ্য, ৭।

হঠরঙ্গ অর্থে ঠক।

জুয়ারিদের বিষময় প্রভাবও সমাজদেহে ছড়িয়েছিল ব্যাপক ভাবে। চৈতন্যের কাছে নানা লোক নানা প্রার্থনা নিয়ে আসতো তাদের—

কেহ বোলে পুত্র মোর পরম জুয়াব—

মোর এই বর যেন না খেলায আর। চৈ-ভা, অন্ত্য, ৩।

কবি বলরাম দাসও জুয়ারির উপমা দিয়েছেন—

সখিহে কি ভেল এ বর নারী।

করহুঁ কপোল থাকিত রহু ঝামরি

জনু ধন হারি জুযারি।

দৈবনির্ভরতা

দেশে যে অস্বাভাবিক অব্যবস্থা ও অরাজকতার উল্লেখ করা হলো তাতে লোকের মনে দৈবনির্ভরতা বেড়ে যাওয়া বিচিত্র নয। রাজশক্তি যথন স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে, জীবনের কোনো নিশ্চয়তা থাকে না, মানুষ তথন দৈবকৃপায় বিপদ উত্তীর্ণ হতে চায়। ফলে মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস কমে আসে ও অলৌকিক শক্তির ওপর আস্থা সে পরিমাণে বেড়ে চলে, নানা কুসংস্কারে পূর্ণ হয় তাদের মন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধা বারবার দৈবের আঘাতের বিরুদ্ধে বিলাপ করেছেন। বাস্তব সংসারে পাওয়া অবিচারের কারণ তিনি অতিপ্রাকৃতে আরোপ করে সান্ত্বনা পেতে চেয়েছেন। তাঁর এ জাতীয় অজস্র উক্তি থেকে দুয়েকটি উদ্ধৃত হলো।

কইলোঁ খণ্ডব্রত আর জরমত
তেঁ বা দুখিনী মোএঁ। পৃ, ১৫।
ঘরের বাহির হৈতেঁ তেলিনি তেল বিচিতেঁ
কালকাক রএ সুখান গাছের ডালে
আগেঁ সুনা ঘটে নারী হাঁছী জিঠি হো না বারী
চলিলোঁ তাহার উচিত পাওঁ ফলে। পৃ, ৪৬।
কথোদুর পথে মোঁ দেখিলোঁ সগুনী
হাথে খাপর ভিখ মাঙ্গ এ যোগিনী।
কান্ধে কুরুআ লআঁ তেলী আগে জা এ
সুখান ডালত বসি কাক কারে রাএ। পৃ,১২৫। ইত্যাদি।

রাধার এই বিলাপ অবাস্তব কিংবা কার্য্যকারণ রহিত নয়, আর তাঁর একারও নয়। মধ্যযুগের একজন সাধারণ বাঙালীর মনোভাব ছিল এরকম। মানুষের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে তান্ত্রিক ও জ্যোতিষীদের পেশা স্ফীত হয়ে উঠেছিল। স্বয়ং চৈতন্যদেবও জ্যোতিষীকে অতীত জন্মবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করার কৌতূহল দমন করতে পারেন নি—

আর দিন জ্যোতিষ এক সর্ব্বজ্ঞ আইল
তাহারে সম্মান করি প্রভু প্রশ্ন কৈল।
কে ছিলাঙ পূর্ব্বজন্মে আমি কহ গণি
গণিতে লাগিলা সর্ব্বজ্ঞ প্রভু বাক্য শুনি। চৈ-চ, আদি,

উপসংহার

চৈতন্য জীবনী ও কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলিতে যে সব সামাজিক চিত্র পাওয়া যায় তাতে ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা দেশের চেহারা মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই চিত্র খুব সুখের নয়।

দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অশান্তির কথা বলেছি। এরকম অবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চৈতন্যের জীবদ্দশায় সাধারণ লোকের যেটুকু আর্থিক সমৃদ্ধি ছিল তাও কালক্রমে নষ্ট হয়ে যায় বলে অনুমিত হয়।

এ সমস্ত কাব্যে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন পরিচয় নয়, বিশেষ ভাবে হিন্দু

সম্প্রদায়ের কথা জানা যায়। সে যুগে হিন্দুসমাজ আত্মরক্ষার জন্য সঙ্কীর্ণ কূর্ম্ম-বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছিল একথা সবাই জানেন। বহিরাগত নানা জাতি হিন্দুসম্প্রদায়ের নিম্নবর্ণের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছিল ক্রমশ, কিন্তু ব্রাহ্মণ ছিলেন সমাজের শীর্ষে। প্রাচীন পুরাণগুলিতে যেমন ব্রাহ্মণের মহিমা ও তাঁকে ধান্যোৎপাদী ভূমি দান করার পুণ্য কীর্ত্তিত হয়েছে আলোচ্য যুগের অনেক গ্রন্থও তেমনি ব্রাহ্মণ্য গৌরব প্রচারে পূর্ণ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে বলা হচ্ছে—

ভূমিং দদাতি যঃ কালে যঃ সাধুশ্চানুমোদতে
স প্রযাতি চ বৈকুণ্ঠং মিত্র গোত্রসমন্বিতঃ। প্রকৃতি খণ্ড, ৯।

আর, পাপীদের তালিকায় দেখি—

দেবদ্রব্যাপহারী চ বিপ্রদ্রব্যাপহারকঃ
লাক্ষা লোহরসনাং চ বিক্রেতা দুহিতু স্তথা। প্রকৃতি খণ্ড, ৬।

শেষের শ্লোকটি লক্ষণীয়। দেশে যে কন্যা বিক্রয়ের ব্যবসা ছিল এতে তার নিন্দা করা হয়েছে। এ সব নৈতিক অধোগতির পরিসূচক।

প্রত্যুত পক্ষে, চৈতন্য জীবনী ও কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যসমূহ পাঠ করলে দেশের নৈতিক অবস্থা বিষয়ে উচ্চ ধারণা হয় না। কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যগুলি বহু নীতি বিরুদ্ধ কাহিনীতে সমাকীর্ণ। আধ্যাত্মিকতার আবরণে এ সব কাহিনীর হীনতা ঢাকা পড়েনি। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণটিকে এ জাতীয় কাহিনীর আকর বললে অত্যুক্তি হয় না।

দেশে যখন আর্থিক সচ্ছলতা ছিল তখনো লোকে ধর্ম্ম বিষয়ে উদাসীন ছিল। চৈতন্যের জন্মকালে নবদ্বীপে বিলাস প্রবণতা অতিরিক্ত ছড়াবার ফলে ধর্ম্ম ও নীতিকথা হয়েছিল উপহাসের বস্তু। বৃন্দাবন দাস সখেদে বলেছেন—

জগৎ প্রমত্ত ধন পুত্র মিথ্যা রসে
দেখিলে বৈষ্ণবমাত্র সবে উপহাসে।
আর্যাতর্জা পড়ে সব বৈষ্ণব দেখিয়া
যতি সতী তপস্বীও যাইব মরিয়া।
তারে বলি সুকৃতী যে দোলা ঘোড়া চড়ে
দশ বিশজন যার আগে পাছে রড়ে।
এত যে গোসাঞি ভাবে করহ ক্রন্দন
তবু ও দারিদ্র্য দুঃখ না হয় খণ্ডন। চৈ-ভা, আদি, ৫।

দেশব্যাপী অনাচারের আর একটি নিদর্শন, কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য সমূহে চিত্রিত কলিযুগ। কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল কাব্য থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে—

তপস্যা ছাড়িবে সত্য দেব নারায়ণ
সদা কহিবেক মিথ্যা কলির ব্রাহ্মণ।
অভক্ষ্য ভক্ষিবে দ্বিজ আপনার সুখে
বিষয় নিষ্ঠার কৃমি ভুঞ্জিবে কৌতুকে।
কলিযুগে ব্রাহ্মণ করিবে চুরিদারি
শূদ্র হই এ্যা হরিবেক ব্রাহ্মণের"নারী। পৃ, ৩৬৮।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রায় একই রকম কথা বলেছেন কৃষ্ণ—

না বোল না বোল রাধা হেনস বচন
কৃষ্ণে ভার বহিলেঁ মজিব ত্রিভুবন।
কনিষ্ঠে লংঘিব জেষ্ঠ হআঁ দুঠমনে
প্রবল হৈআঁ সূদ্রেঁ লংঘিব ব্রাহ্মণে।
পুত্রেঁ বাপ লংঘিব শিষ্য গুরুজনে
পুণ্য লংঘিব জনে হআঁ পাপমনে।
সেবকেঁ লংঘিব প্রভু নারী নিজ পতী
আপণা মজায়িব ব্রত লংঘিআঁ সতী। পৃ, ৬৮।

এই বর্ণনা সম্পূর্ণ মৌলিক নয়, এর পেছনে সংস্কৃত পুরাণগুলির কলিবর্ণনার প্রভাব রয়েছে। কিন্তু কিছুটা বাস্তবতার ছাপ আছে সংশয় নেই। জয়ানন্দ বলেছিলেন 'ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারস্য পড়িবে'। তাঁর এই বর্ণনা অনেকাংশে মিলে গিয়েছিল এবং ব্রাহ্মণ্য শাসিত হিন্দু ধর্ম্মের অধোগতি ও নিম্ন বর্ণ বিদ্বেষের ফলেই শূন্য পুরাণের লেখক—

দেউল দেহারা ভাঙে গোহাড়ের ঘায়
হাতে পুঁথি কর‍্যা যত দেয়াসি পলায়।

—এই দৃশ্য দেখে আনন্দ লাভ করেছিলেন। কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য সমূহের কলিযুগ বর্ণনা যে একান্ত কৃত্রিম কিংবা যুগ পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত নয় তা আরো স্পষ্ট হয় যখন 'রামচরিত মানসে' পড়ি—

সোঈ সয়ান জো পরধন হারী
জো কর দম্ভ সো বড় আচারী।

জো কহ কূট মসখরী জানা
কলিযুগ সোই গুণবন্ত বখানা। উত্তরকাণ্ড।

—যে পরধন হরণ করে সেই চতুর, যে দম্ভ করে সেই আচারশীল, যে মিথ্যা বলে আর ব্যঙ্গ করে, কলিযুগে সেই গুণবন্ত বলে কীর্ত্তিত হয়।

সে যুগের সমাজের এই পরিচয় গৌরবের নয়। মধ্যযুগের সমাজ জীবনের যে সব খণ্ড চিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাতে অনুমান করি সমগ্রভাবে সে জীবন আশার আলোকে উজ্জ্বল ছিলনা, দুঃখ ও হতাশা ছিল প্রবল। সাধারণ মানুষের কাছে দৈনন্দিন জীবন ছিল কঠিন ও নিষ্করুণ। আর্থিক দুর্গতি ও রাজনৈতিক পেষণের ফলে মানুষের উৎসাহ উদ্যম প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। দুর্নীতির প্রভাবও ছড়াচ্ছিল চতুর্দ্দিকে। হয়তো কোনো কোনো ধর্ম্ম-আন্দোলন তাদের স্তিমিত প্রায় চেতনায় উৎসাহ সঞ্চার করতে সক্ষম হয়। কিন্তু কোনো ধর্ম্মসম্প্রদায়ই একেবারে ব্যাধি মুক্ত ছিলনা! সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন দুর্গতির মধ্যে ধর্ম্ম যে কোনো মুক্তির আশ্বাস দিতে পারেনি ও তার প্রেরণা নিস্ফল প্রতিপন্ন হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের একজন লেখকের রচনায় তার উদাহরণ মেলে। 'বৃদ্ধাবতার'এ রামানন্দ ঘোষ আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে সাধারণ মানুষের হতাশা চমৎকার রূপায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন তিনি নিজেও একবার সন্ন্যাস গ্রহণ করে পরিণামে তার ব্যর্থতা বুঝতে পারেন। কবি শূন্য মনে লিখছেন—

শরীর করিনু পণ আমি এ পামর
না হৈল (বস্তু) চর্ম্ম চক্ষের গোচর।
ধনীতে বান্ধয়ে ধন জলে বান্ধে জল
নাহি মিলে কাঙালের কড়ার সম্বল।

মধ্যযুগের যে সামাজিক রূপরেখা এই অধ্যায়ের গোড়ার দিকে দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে এই বর্ণনার গরমিল নেই।

সঙ্কেত

চৈ-ভা—চৈতন্য ভাগবত—বৃন্দাবন দাস।
চৈ-ম, লোচন—চৈতন্য মঙ্গল—লোচন দাস।
চৈ-ম, জয়ানন্দ—চৈতন্য মঙ্গল—জয়ানন্দ।
চৈ-চ—চৈতন্য চরিতামৃত—কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

গ্রন্থপঞ্জী

বৈষ্ণব সাহিত্য সংক্রান্ত বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধের কাছে আমি ঋণী। তাদের সবকটির নামোল্লেখ করা সম্ভব নয়। এই গ্রন্থ প্রস্তুতকার্যে যে সব লেখার সাহায্য অপরিহার্য ছিল শুধু তাদের তালিকা দিয়েছি।

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞান দাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস, লোচন দাস প্রভৃতি কবিদের আলোচনায় সাধারণ বাজার-চলতি সংস্করণের পাঠই গৃহীত হয়েছে। বৈষ্ণবপদাবলীর ও জীবনীকাব্য সমূহের শুদ্ধপাঠ নির্ধারণ এক অস্বস্তিকর সমস্যা। আমি এবিষয়ে স্বাধীন কোনো পথ অবলম্বন করিনি। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন তৎসম্পাদিত 'বৈষ্ণবপদাবলী' ও অন্যান্য গ্রন্থে যে পাঠ স্থির করেছেন সেগুলি গ্রহণ করেছি। তার বাইরে অন্যান্য পদগুলি সম্পাদকেরা যে ভাবে ছেপেছেন তাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি। বিদ্যাপতির পদগুলো মূলত শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত 'বিদ্যাপতি'র পদাবলী থেকে গৃহীত। পদগুলির ভাবার্থও মোটামুটি তাঁদের অনুসরণ করে লেখা। তবে যেসব পদ এঁরা বিদ্যাপতির রচিত বলে নির্দেশ করেছেন, অথচ সত্যিই বিদ্যাপতির লেখা কিনা সে বিষয়ে নিঃসংশয় হতে পারিনি, সেসব পদের তলায় বিদ্যাপতির নামের পাশে প্রশ্ন বোধক চিহ্ন দেওয়া রয়েছে।

আকর গ্রন্থ ॥ ক। সংস্কৃত

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ—আনন্দাশ্রম সংস্কৃত সিরিজ।

খ। বাংলা পুঁথি

[সংকেত—ক—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ; খ—এশিয়াটিক সোসাইটি ; গ—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ]

অভিরাম দাস—গোবিন্দ বিজয় (গ-১২১৩, ১২১৪, ১৬২৬ ; ক-৯৩৮, ৯৪০, ৯৪৯, ১০৫৯, ৩৩২৬)।

গোপাল সিংহদেব—রাধাকৃষ্ণ মঙ্গল (গ-১২৬৯)।

(দ্বিজ) গোবিন্দ—কৃষ্ণমঙ্গল (খ-৪১৩৪)।

ঘনশ্যামদাস—শ্রীকৃষ্ণবিলাস (খ-৫৪২১)।

(দ্বিজ) জীবন—কৃষ্ণমঙ্গল (ক-১০৩৬)।

(দ্বিজ) তিলকরাম—গোবিন্দবিলাস (ক-১৮৩০)।

দৈবকীনন্দন সিংহ—গোপাল বিজয় পাঁচালী (ক-৯৬০, ৯৬১, ৯৬৩ ;
খ ৪৮৮০ ; গ-৩১২)।

পরাণ দাস—রসমাধুরী [ক—৩২৮৯]।

বলরাম দাস—কৃষ্ণলীলামৃত [গ—৩৫৯]।

(দ্বিজ) বাণীকণ্ঠ—শ্রীকৃষ্ণ চরিত [খ—৪৯২৩]।

যদুনন্দন দাস—শুকদেব চরিত্র [খ—৫৬৬৯]।

যশশ্চন্দ্র—গোবিন্দ বিলাস [খ—৫৬৭৮]।

[দ্বিজ] রমানাথ—শ্রীকৃষ্ণবিজয় [গ—১২৯৩]।

[দ্বিজ] হরিদাস—মুকুন্দমঙ্গল [ক—১০০৫, ৩৫৯২]।

গ। বাংলা মুদ্রিত কাব্য

কবি বল্লভ—রসকদম্ব [তারকেশ্বর ভট্টাচার্য ও আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত,
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত]।

কৃষ্ণদাস—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল [তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
প্রকাশিত]।

['শ্রীকৃষ্ণ কিঙ্কর'] কৃষ্ণদাস—শ্রীকৃষ্ণ বিলাস [অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত,
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত]।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ—চৈতন্য চরিতামৃত [রাধাগোবিন্দ নাথ প্রভৃতি সম্পাদিত
বহু সংস্করণ]।

কৃষ্ণরাম দত্ত—রাধিকা মঙ্গল [রাজচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
প্রকাশিত]।

গোবিন্দ দাস—পদাবলী [বসুমতী প্রকাশিত]।

জ্ঞানদাস—পদাবলী [বসুমতী ; হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলিকাতা
বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত]।

চণ্ডীদাস—পদাবলী [বসুমতী ; হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সুনীতিকুমার
চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সম্পাদিত]।

জগদানন্দ—পদাবলী [ধীরানন্দ ঠাকুর সম্পাদিত]

জয়ানন্দ—চৈতন্যমঙ্গল।

দৌলৎ কাজী—সতীময়না [সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল সম্পাদিত, বিশ্বভারতী সংস্করণ]।

পরশুরাম চক্রবর্তী—কৃষ্ণমঙ্গল [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত]।

বড়ু চণ্ডীদাস—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন [বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত, চতুর্থ সংস্করণ]।

বলরাম দাস—পদাবলী [ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স প্রকাশিত]।

বিদ্যাপতি—পদাবলী [খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত]।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী—ক্ষণদা গীত চিন্তামণি।

বৈষ্ণবদাস—পদকল্পতরু [সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত]।

বৃন্দাবন দাস—চৈতন্য ভাগবত [সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত]।

[দীন] ভবানন্দ—হরিবংশ [সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত]।

মাধব-আচার্য—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল বা ভাগবতসার [মাখনলাল ঘোষ মুদ্রিত, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৩৩৩]।

মালাধর বসু—শ্রীকৃষ্ণবিজয় [খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রকাশিত]।

রঘুনাথ ভাগবতাচার্য—কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী [নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত, বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত, বঙ্গবাসী সংস্করণ]।

রায়শেখর—পদাবলী [যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ও দ্বারেশ শর্মাচার্য সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত]।

লোচন দাস—চৈতন্য মঙ্গল ও পদাবলী [মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ সম্পাদিত]।

শঙ্কর চক্রবর্তী 'কবিচন্দ্র'—গোবিন্দমঙ্গল [মাখনলাল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত]।

[দুঃখী] শ্যামদাস—গোবিন্দ মঙ্গল [ঈশানচন্দ্র বসু সম্পাদিত বঙ্গবাসী সংস্করণ]।

সুকুমার সেন সম্পাদিত—বৈষ্ণব পদাবলী [সাহিত্য আকাদেমী]।

সহায়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ

ক ॥ বাংলা গ্রন্থাদি

গোপাল হালদার—বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, প্রথমখণ্ড।

বিমানবিহারী মজুমদার—বৈষ্ণব সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ]।

—চৈতন্য চরিতের উপাদান।

সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড।

—মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী।

—বিচিত্র সাহিত্য, প্রথম খণ্ড।

সুশীলকুমার দে—নানা নিবন্ধ।

খ। ইংরাজী গ্রন্থাদি

Archer, W G —The loves of Krishna

Bhandarkar, R G —Vaisnavism, Saivism and minor religious Systems, Collected Works, vol IV

Chatterji, S. K —Krisna Vasudeva and Krisna Dvaipayana Vyasa, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol XVI, No. 1.

De, S K —Early History of the Vaisnava faith and movement in Bengal.

Gonda, J —Aspects of early Visnuism.

Hazra, R C —Studies in the Puranic records on Hindu rites and Customs.

Hutton, J. H.—Caste in India.

Kakati, B. K.—Visnuite myths and legends

Kennedy—The Chaitanya movement.

Mazumder, A K.—A note on the development of Radha cult-Annals of the Bhandarkar

Oriental Research Institute,
Vol. XXXVI.

Pusalker, A. D.—Studies in Epics and Puranas of India.

Ray Chaudhuri, H. C.—Materials for the Study of the early history of the Vaisnva sect.

Ray Chaudhuri, T. K—Bengal under Akbar and Jahangir.

Sarkar, J. N.—India through the ages.

,, (Ed)—History of Bengal, Vol. II.

Sen, Sukumar—A history of Brajabuli Literature.

—Four Indo-Aryan Etymologies (Indian Linguistics, Jules Bloch memorial No.)

—The earliest form and performance of the mangala lyric (Journal of the University of Gauhati, Vol. II, No. I)